আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

সপ্তম শ্রেণি

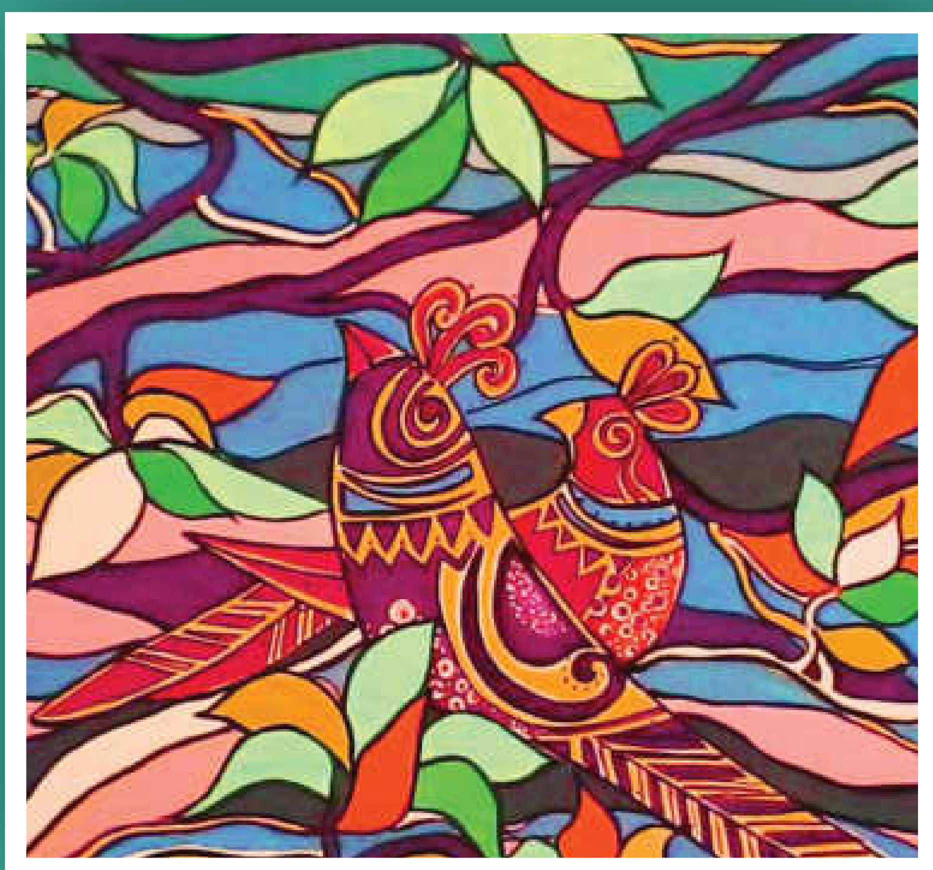

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর

অধ্যাপক ড. খালেদ হোসাইন

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম

অধ্যাপক ড. হিমেল বরকত

অধ্যাপক ড. মো. মেহেদী হাসান

ড. মো. জফির উদ্দিন

ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া

ড. প্রকাশ দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২০

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

২০০৭ সাল থেকে সহপাঠ্যপুস্তক হিসেবে *আনন্দপাঠ* প্রচলিত। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য ২০২১ সালে সপ্তম শ্রেণির *আনন্দপাঠ* নতুন করে সংকলিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভালো লাগা, আনন্দলাভ ও জ্ঞানার্জনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। সংকলনে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের কাহিনি। একই সাথে ভাষাগত সাবলীলতা রক্ষা করারও চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তোতা-কাহিনি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১–৫
জিদ	জসীমউদ্‌দীন	৬–১০
খুদে গোয়েন্দার অভিযান	শহীদ সাবের	১১–১৬
দীক্ষা	মোহাম্মদ নাসির আলী	১৭–২৪
পদ্য লেখার জোরে	মাহমুদুল হক	২৫–৩১
কোকিল	হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্দেরসেন অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু	৩২–৩৯
কিং লিয়ার	উইলিয়াম শেক্সপিয়র রূপান্তর : জাহানারা ইমাম	৪০–৪৭
যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্র	আবুল কাসিম ফেরদৌসি রূপান্তর : মমতাজউদদীন আহমদ	৪৮–৫৭
নাটিকা		
জাগো সুন্দর	কাজী নজরুল ইসলাম	৫৮–৬৫

তোতা-কাহিনি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, কিন্তু জানিত না কায়দা-কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

২.

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে, সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া। রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩.

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, 'শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।' কেহ বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল!'

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুথির কর্ম নয়।'

ভাগিনা তখন পুথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, 'সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না।'

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, 'উন্নতি হইতেছে।'

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪.

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।'

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।'

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫.

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরি ভেরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ কাণ্ডটা দেখিতেছেন!'

মহারাজা বলিলেন, 'আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।'

ভাগিনা বলিল, 'শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি।'

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, 'ওই যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।'

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, 'পাখিটাকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।'

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল

রাশি রাশি পুথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬.

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুর মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝটপট করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, 'এ কী বেয়াদবি।'

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।'

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭.

পাখিটা মরিল। কোনকালে যে কেউ তার ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়।'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে।'

'না।'

'আর কি গান গায়।'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।

রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুথির শুকনো পাতা খসখস গজগজ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

১৩২৫

লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে (৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদাসুন্দরী দেবী। বাল্যকালেই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, গীতিকার, সুরকার, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা। কবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গান অর্থাৎ সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'বলাকা', 'পুনশ্চ', 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'শেষের কবিতা', 'বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'গল্পগুচ্ছ', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'কালান্তর' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (৭ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ) আশি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

একবার 'মূর্খ' তোতা পাখির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন রাজা। রাজার ভাগিনাদের ওপর দেওয়া হলো সেই শিক্ষার ভার। ডাকা হলো রাজপণ্ডিতদের। নানা আলোচনা শেষে তারা সিদ্ধান্ত জানালেন, সামান্য খড়কুটো দিয়ে পাখিটি যে-বাসা বাঁধে, সে-বাসা অধিক বিদ্যাধারণের উপযুক্ত নয়। তাই রাজপণ্ডিতদের পরামর্শ অনুযায়ী পাখির জন্য নির্মিত হলো সোনার খাঁচা। অপূর্ব সে খাঁচা দেখার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকে পড়ল। এরপর পণ্ডিত মশাই এলেন পাখিকে বিদ্যা শেখাতে। পুঁথি-লেখকরা পুঁথির নকল করে করে বিশাল স্তূপ তৈরি করল। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি চলল খাঁচাটার মেরামত ও মেরামতের তদারকি। পাখির শিক্ষা-কার্যক্রম স্বচক্ষে দেখতে চাইলেন রাজা। পাত্র-মিত্র-অমাত্য নিয়ে রাজা শিক্ষাশালায় উপস্থিত হলেন। অমনি বেজে উঠল নানা বাদ্যযন্ত্র। রাজার শিক্ষাশালায় আসার মূল উদ্দেশ্যই ঢাকা পড়ে গেল রাজাকে স্বাগত জানাবার এমন হুলুস্থুল আয়োজনে। এদিকে, শিক্ষার চাপে পাখিটি ধীরে ধীরে আধমরা হয়ে এল। একদিন দেখা গেল, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়ে খাঁচার শিক কাটবার চেষ্টা করছে। পাখির এ 'বেয়াদবি' দেখে ক্ষিপ্ত কোতোয়াল ডেকে আনল কামারকে। এবার পাখির জন্য তৈরি হলো শিকল, কাটা পড়ল ডানা। পণ্ডিতেরাও এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি নিয়ে শিক্ষা দিতে উদ্যত হলো। অবশেষে পাখিটা মারা গেল।

শিক্ষার স্বাভাবিক পথকে রুদ্ধ করে বাড়াবাড়ি রকমের আয়োজন ও জবরদস্তিটাই তোতা-কাহিনিতে করুণরূপে ফুটে উঠেছে। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপশিক্ষার প্রতিফলকে পাখির মৃত্যুর রূপকে তুলে ধরেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

শাস্ত্র — বিশেষ বিদ্যা বা গ্রন্থ।

অবিদ্যা — অজ্ঞতা।

দক্ষিণা — পারিশ্রমিক, প্রণামী।

স্যাকরা — স্বর্ণকার।

হদ্দমুদ্দ — চেষ্টার শেষ পর্যন্ত, যতদূর সম্ভব।
নস্য — তামাকের গুঁড়া।
তলব — ডাকা।
পুথি — পুস্তক, হাতে লেখা বই।
নকল — অনুলিপি।
পর্বতপ্রমাণ — পাহাড়ের সমান।
পারিতোষিক — পুরস্কার, পারিশ্রমিক।
খবরদারি — তত্ত্বাবধান করা।
পালিশ — চকচকে করা।
তনখা — টাকা, মুদ্রা।
খুড়তুতো — চাচাতো, কাকাতো।
মাসতুতো — মাসি বা খালার সন্তান।
কোঠা — বালাখানা-পাকা ঘর, প্রাসাদ।
নিন্দুক — নিন্দা করে যে, গল্পে সত্যবাদী অর্থে।
তদারক — তত্ত্বাবধান, খবরদারি।
স্বয়ং — নিজ।
অমাত্য — মন্ত্রী।
তুরি — বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, রণশিঙ্গা, বিউগল।
ভেরি — বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঢাক।
দেউড়ি — সদর দরজা।
জগঝম্প — জয়ঢাক, প্রাচীন রণবাদ্য বিশেষ।
তদারকনবিশ — তত্ত্বাবধানকারী।
ভদ্র-দস্তুর মতো — শিষ্ট প্রথা অনুযায়ী।
রোমাঞ্চ — শিহরন।
সড়কি — বর্শা, বল্লম।
কোতোয়াল — প্রহরী, নগর-রক্ষক।
হাপর — চুল্লিতে বাতাস দেওয়ার জন্য নলযুক্ত থলি।
ঠাহর — টের পাওয়া, অনুভব করা।
কিশলয় — গাছের কচি পাতা, নতুন পাতা।
মুকুলিত — যা আধফুটন্ত বা যা কুঁড়িতে পরিণত হয়েছে।

জিদ

জসীমউদ্‌দীন

এক তাঁতি আর তার বউ। তারা বড়োই গরিব। কোনোদিন খায়, কোনোদিন খাইতে পায় না। তাঁত খুঁটি চালাইয়া, কাপড় বুনাইয়া, কীই-বা তাহাদের আয়?

আগেকার দিনে তাহারা বেশি উপার্জন করিত। তাহাদের হাতের একখানা শাড়ি পাইবার জন্য কত বাদশাজাদিরা, কত নবাবজাদিরা তাহাদের উঠানে গড়াগড়ি পাড়িত।

তখন একখানা শাড়ি বুনতে মাসের পর মাস লাগিত। কোনো কোনো শাড়ি বুনন করতে বৎসরেরও বেশি সময় ব্যয় হইত।

সেইসব শাড়ি বুনাইতে কতই-না যত্ন লইতে হইত। রাত থাকিতে উঠিয়া তাঁতির বউ চরকা লইয়া ঘড়র-ঘড়র করিয়া সুতা কাটিত। খুব ধরিয়া ধরিয়া চোখে নজর আসে না, এমনই সরু করিয়া সে সুতা কাটিত। ভোরবেলায় আলো-আঁধারির মধ্যে সুতা-কাটা শেষ করিতে হইত। সূর্যের আলো যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, তখন সুতা কাটিলে সুতা তেমন মুলাম হইত না।

তাঁতি আবার সেই সুতায় নানা রকমের রং মাখাইত। এত সরু সুতা আঙুল দিয়া ধরিলে ছিঁড়িয়া যায়। তাই বাঁশের সরু শলার সঙ্গে আটকাইয়া, সেই সুতা তাঁতে পরাইয়া, কত রকমের নকশা করিয়া তাঁতি কাপড় বুনাইত। সেই শাড়ির ওপর বুনট করা থাকিত কত রাজকন্যার মুখের রঙিন হাসি, কত রূপকথার কাহিনি, কত বেহেশতের আরামবাগের কেচ্ছা। ঘরে ঘরে মেয়েরা সেই শাড়ি পরিয়া যখন হাঁটিত, তখন সেই শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে কত গুল-এ-বকওয়ালি আর কত লুবানকন্যার কাহিনি ছড়াইয়া পড়িত।

শাড়িগুলির নামই-বা ছিল কত সুন্দর। কলমি ফুল, গোলাপ ফুল, মন-খুশি, রাসমণ্ডল, মধুমালা, কাজললতা, বালুচর। শাড়িগুলির নাম শুনিয়াই কান জুড়াইয়া যায়। কিন্তু কীসে কী হইয়া গেল! দেশের রাজা গেল। রাজ্য গেল। দেশবাসী পথের ভিখারি সাজিল। বিদেশি বণিক আসিয়া শহরে কাপড়ের কল বসাইল। কলের ধোঁয়ার ওপর সোয়ার হইয়া হাজার হাজার কাপড় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল; যেমন সস্তা তেমনই টেকসই। আবার যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। তাঁতির কাপড় কে আর কিনিতে চায়!

হাট হইতে নকশি-শাড়ি ফিরাইয়া আনিয়া তাঁতিরা কাঁদে। শূন্য হাঁড়িতে চাউল না-পাইয়া তাঁতির বউ কাঁদে। ধীরে ধীরে তারা সেই মিহিন শাড়ি বুনন ভুলিয়া গেল। এখনকার লোক নকশা চায় না। তারা চায় টেকসই আর সস্তা কাপড়। তাই তাঁতি মিলের তৈরি মোটা সুতার কাপড় বুনায়। সেই সুতা আবার যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। চোরাবাজার হইতে বেশি দামে কিনিতে হয়। এখন কাপড় বেচিয়া যাহা লাভ হয়, তাহাতে কোনোরকমে শুধু বাঁচিয়া থাকাই যায়। এটা-ওটা কিনিয়া মনের ইচ্ছামতো খাওয়া যায় না।

কিন্তু তাঁতির বউ সে কথা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। সে তাঁতিকে বলে, 'তোমার হাতে পড়িয়া আমি একদিনও ভালোমতো খাইতে পারিলাম না। এত করিয়া তোমাকে বলি, হাটে যাও। ভালোমতো একটা মাছ কিনিয়া আনো। সে কথা কানেই তোলো না।'

তাঁতি উত্তর করে, 'এই সামনের হাটে যাইয়া তোমার জন্য ভালোমতো একটা মাছ কিনিয়া আনিব।' সে হাট যায়, পরের হাট যায়, আরও এক হাট যায়, তাঁতি কিন্তু মাছ কিনিয়া আনে না।

সেদিন তাঁতির বউ তাঁতিকে ভালো করিয়াই ধরিল, 'এ হাটে যদি মাছ কিনিয়া না-আনিবে তবে রহিল পড়িয়া তোমার চরকা, রহিল পড়িয়া তোমার নাটাই, আমি আর নলি কাটিব না। রহিল পড়িয়া তোমার শলা, আমি আর তেনা কাড়াইব না। শুধু শাকভাত আর শাকভাত, খাইতে খাইতে পেটে চর পড়িয়া গেল। তাও যদি পেট ভরিয়া খাইতে পাইতাম।'

তাঁতি কী আর করে? একটা ঘষাপয়সা ছিল, তাই লইয়া তাঁতি হাটে গেল। এ-দোকান ও-দোকান ঘুরিয়া অনেক দর-দস্তুর করিয়া সেই ঘষাপয়সাটা দিয়া তাঁতি তিনটি ছোট্ট মাছ কিনিয়া আনিল।

মাছ দেখিয়া তাঁতির বউ কী খুশি! আহ্লাদে আটখানা হইয়া সে মাছ কুটিতে বসিল। এভাবে ঘুরাইয়া, ওভাবে ঘুরাইয়া কত গুমর করিয়াই সে মাছ কুটিল! যেন সত্য সত্যই একটা বড়ো মাছ কুটিতেছে। তারপর পরিপাটি করিয়া সেই মাছ রান্না করিয়া তাঁতিকে খাইতে ডাকিল।

তাঁতি আর তার বউ খাইতে বসিল। তিনটি মাছ। কে দুইটি খাইবে, আর কে একটি খাইবে— কিছুতেই তারা ঠিক করিতে পারে না। তাঁতি বউকে বলে, 'দেখ, রোদে ঘামিয়া, কত দূরের পথ হাঁটিয়া এই মাছ কিনিয়া আনিয়াছি। আমি দুইটি মাছ খাই। তুমি একটা খাও।'

বউ বলে, 'উঁহু। তাহা হইবে না। এতদিন বলিয়া কহিয়া কত মান-অভিমান করিয়া তোমাকে দিয়া মাছ কিনাইয়া আনিলাম। আমিই দুইটি মাছ খাইব।' তাঁতি বলে, 'তাহা কিছুতেই হইবে না।' কথায় কথায় আরও কথা ওঠে! তর্ক বাড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে রাতও বাড়ে, কিন্তু কিছুতেই মীমাংসা হয় না, কে দুইটি মাছ খাইবে আর কে একটি মাছ খাইবে! অনেক বাদানুবাদ, অনেক কথা কাটাকাটি, রাতও অর্ধেক হইল। তখন দুইজনে স্থির করিল, তাহারা চুপ করিয়া ঘুমাইয়া থাকিবে। যে আগে কথা বলিবে, সে-ই একটা মাছ খাইবে।
তাঁতি এদিকে মুখ করিয়া, তাঁতির বউ ওদিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল। থালাভরা ভাত-তরকারি পড়িয়া রহিল। রাত কাটিয়া ভোর হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই। ভোর কাটিয়া দুপুর হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই।

দুপুর কাটিয়া সন্ধ্যা হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই। বেলা যখন পড়-পড়, আকাশের কিনারায় সাঁঝের কলসি ভর-ভর, পাড়ার লোকেরা বলাবলি করে, 'আরে ভাই! আজ তাঁতি আর তাঁতির বউকে দেখিতেছি না কেন? তাদের বাড়িতে তাঁতের খটর-খটরও শুনি না, চরকার ঘড়র-ঘড়রও শুনি না। কোনো অসুখ-বিসুখ করিল নাকি? আহা! তাঁতি বড়ো ভালো মানুষটি। বেচারা গরিব হইলে কী হয়, কারো কোনো ক্ষতি করে নাই কোনোদিন।'
একজন বলিল, 'চলো ভাই! দেখিয়া আসি ওদের কোনো অসুখ-বিসুখ করিল নাকি।'
পাড়ার লোকেরা তাঁতির দরজায় আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নাই। ভিতর হইতে দরজা বন্ধ।
তখন তারা দরজা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তাঁতি আর তাঁতির বউ শুইয়া আছে। নড়ে না, চড়ে না–ডাকিলেও সাড়া দেয় না। তারপর গাঁয়ের মোল্লা আসিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিল, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।
আহা কী ভালোবাসা রে! তাঁতি মরিয়াছে, তাহার শোকে তাঁতিবউও মরিয়া গিয়াছে। এমন মরা খুব কমই দেখা যায়। এসো ভাই আতর-গোলাপ মাখাইয়া কাফন পরাইয়া এদের একই কবরে দাফন করি।
গোরস্তান সেখান হইতে এক মাইল দূরে। এই অবেলায় কে সেখানে যাইবে? পাড়ার দুইজন ইমানদার লোক মরা কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতে রাজি হইল। মোল্লা সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কবর দেওয়ার সময় জানাজা পড়িতে হইবে। গোরস্তানে মুরদা আনিয়া নামানো হইল; মোল্লা সাহেব একটি খুঁটার সঙ্গে তাঁর ঘোড়াটা বাঁধিয়া সমস্ত তদারক করিতে লাগিলেন।

তাঁর নির্দেশমতো কবর খোঁড়া হইল। তাঁতি আর তাঁতির বউকে গোসল করাইয়া, কাফন পরাইয়া সেই কবরের মধ্যে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তখনও তাহারা কথা বলে না। তাহাদের বুকের ওপর বাঁশ চাপাইয়া দেওয়া হইল। তখনও তাহারা কথা বলে না। তারপর যখন সেই বাঁশের ওপর কোদাল কোদাল মাটি ফেলানো হইতে লাগিল, তখন বাঁশ-খুঁটি সমেত তাঁতি লাফাইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুই দুইটা খা, আমি একটা খাব।'

সঙ্গে ছিল দুইজন লোক আর মোল্লা সাহেব। তারা ভাবিল, নিশ্চয়ই ওরা ভূত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গের দুইজন লোক মনে করিল, তাঁতি যে তার বউকে দুইটা খাইতে বলিল, নিশ্চয়ই সে তাহাদের দুইজনকে খাইতে বলিল। তখন তাহারা ঝুড়ি কোদাল ফেলিয়া দে-দৌড়, যে যত আগে পারে! মোল্লা সাহেব মনে করিলেন, তাঁতি নিজেই আমাকে খাইতে আসিতেছে। তখন তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘোড়ার পিঠে সোয়ার হইয়া মারিলেন চাবুক। ভয়ের চোটে খুঁটি হইতে ঘোড়ার দড়ি খুলিয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন।

চাবুক খাইয়া ঘোড়া খুঁটি উপড়াইয়া দিল ছুট। ঘোড়া যত চলে সেই দড়িতে বাঁধা খুঁটা আসিয়া মোল্লা সাহেবের পিঠে তত লাগে। তিনি ভাবেন, বুঝি ভূত আসিয়া তাঁর পিঠে দাঁত ঘষিতেছে। তখন তিনি আরও জোরে জোরে ঘোড়ার গায়ে চাবুক মারেন, আর দড়ি সমেত খুঁটা আসিয়া আরও জোরে জোরে তাঁর পিঠে লাগে।

হাসিতে হাসিতে তাঁতি আর তাঁতির বউ বাড়ি আসিয়া ভাত খাইতে বসিল।

লেখক-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে। পল্লিকবি হিসেবে তিনি বিশেষভাবে খ্যাত। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় গ্রামবাংলার রূপ ও সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে সহজ-সরল ভাষা আর সাবলীল ছন্দে। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'রাখালী', 'ধানখেত' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, ভ্রমণ-কাহিনি, স্মৃতিকথা, নাটক, গীত ও প্রবন্ধের বইও রচনা করেছেন। শিশুদের জন্য লিখেছেন 'ডালিম কুমার' নামে একটি অসাধারণ বই। সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য জসীমউদ্‌দীন বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা পান। তিনি একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকেও ভূষিত হন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

এক তাঁতি আর তাঁতিবউ তাঁত চালিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ দেশে কাপড়ের কল আসলে তাঁতিদের কাপড় আর কেউ কিনতে চাইল না। ফলে তাঁতি পরিবার বড়ো অভাবে পড়ল। এত অভাবে যে, তারা ভালো করে খেতেও পায় না। বউয়ের আবদারে বাধ্য হয়ে অভাবের সংসারে তাঁতি হাট থেকে তিনটি ছোটো আকারের মাছ কিনে আনল, সখ করে তাঁতিবউ তা রান্না করল। দুজনে খেতে বসলে তাদের মধ্যে কথা উঠল কে দুটি খাবে, কেই-বা একটি খাবে। পরে মীমাংসা হলো তারা চুপ করে থাকবে, যে আগে কথা বলবে সে-ই একটা খাবে। এমন জেদ ধরল দুজনে যে, কেউ কথা আর বলে না। মরে যাওয়ার জোগাড় হলো তাদের, পাড়া-প্রতিবেশীরা মনে করল দুজন বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হলো, কবর খুঁড়ে গোর দেওয়া হচ্ছে এমন সময় তাঁতি 'তুই দুইটা খা, আমি একটা খাব' বলে লাফ দিয়ে উঠল। যারা গোর দিতে গিয়েছিল, মুরদা কথা বলছে দেখে তারা ভাবল, এরা ভূত হয়ে গেছে; তাই সবাই দৌড়ে পালাল। পরে তাঁতি ও তাঁতিবউ বাড়িতে ফিরে ভাত খেতে বসল।

অনাবশ্যক জেদ যে মানুষের জীবনকে জটিল করে তোলে এবং অন্যকেও সমস্যায় ফেলে দেয়, গল্পটিতে এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

জিদ	— একগুঁয়েমি, নাছোড় ভাব।
চরকা	— সুতাকাটার যন্ত্র।
মুলাম	— মোলায়েম, নরম।
গুল-এ-বকওয়ালি	— বাকওয়ালি ফুল। এই নামে এক পরি ছিলেন। এখানে তার কাহিনির কথাই বলা হয়েছে।
বণিক	— ব্যবসায়ী।
সোয়ার	— আরোহণ করা।
টেকসই	— মজবুত।
নাটাই	— যে চরকি বা শলাকায় সুতা জড়ানো হয়।
শলা	— কাঠি।
নলি	— সুতা জড়াবার ছোটো নল।
তেনা	— কাপড়ের টুকরা।
ঘষাপয়সা	— ক্ষয়ে যাওয়া পয়সা।
আহ্লাদে আটখানা	— ভীষণ খুশি হওয়া।
গুমর	— গর্ব, দেমাক, অহমিকা।
বাদানুবাদ	— তর্ক-বিতর্ক।
পরিপাটি	— সাজানো-গোছানো।
মীমাংসা	— বিবাদ বা সমস্যার সমাধান।
মুরদা	— মৃতদেহ।

খুদে গোয়েন্দার অভিযান

শহীদ সাবের

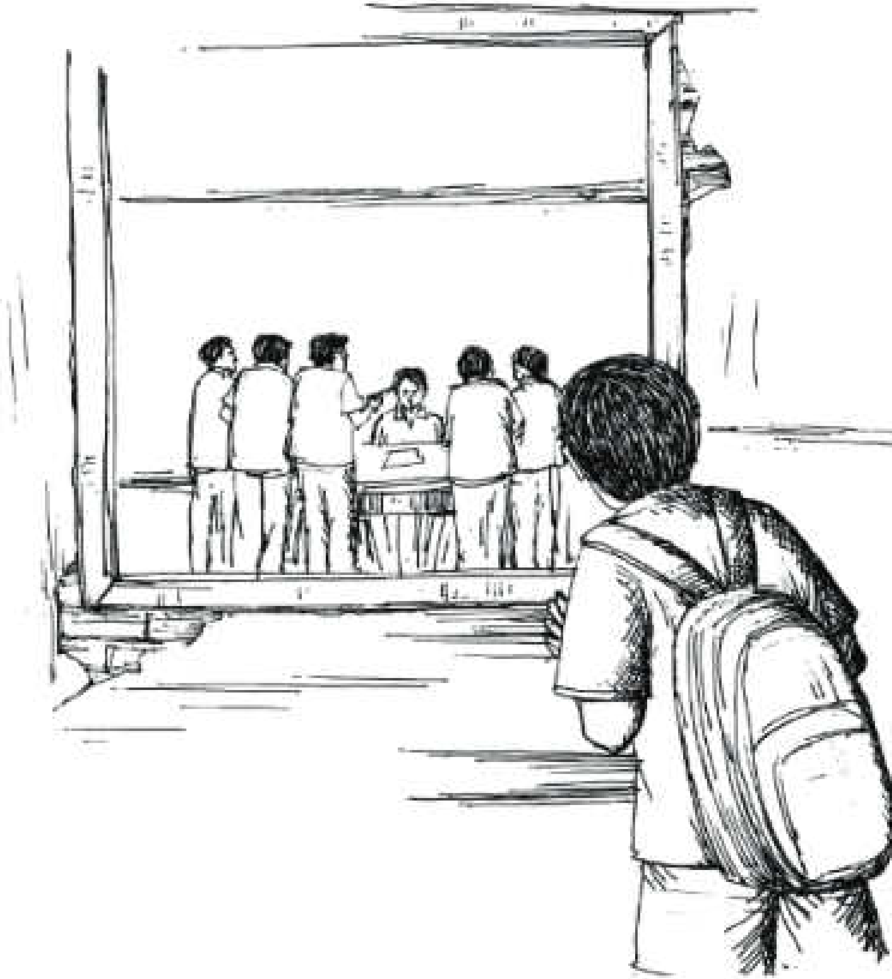

স্কুল থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল, ছোট্ট একটি গলির ভেতর দিয়ে আসছিল খোকা, অন্ধকার হয়ে এসেছে, গলির ভেতরটাতে আরো অন্ধকার, এদিকটায় গ্যাসবাতি জ্বলে, আর সেই গ্যাসের আবছা আলোয় পথ চিনে যেতে বেশ অসুবিধে।

গলির মাঝামাঝি এসেই হঠাৎ কী একটা শব্দ এল তার কানে, থমকে দাঁড়ায় খোকা। এক মিনিট মাত্র, তারপরই একটা অসম্ভব চিন্তায় বুকটা তার ধড়াস করে উঠল, ভয়ে হাঁটু দুটো কাঁপছে তার। সে ভাবতে লাগল, কী করবে? কী তার করা উচিত? ইতস্তত করতে লাগল খোকা।

কিন্তু বেশিক্ষণ এই অবস্থা রইল না। ধীরে ধীরে মনে সাহস ফিরিয়ে আনল সে। তার মনে হলো– এই মুহূর্তে সে যেন একটা বিরাট কর্তব্য করতে যাচ্ছে। অসীম সাহসে বুক বেঁধে সে পা টিপে টিপে এগোলো।

পাশেই একটা পুরোনো একতলা বাড়ি। বাড়িখানার প্রায় ভেঙে-পড়া দশা। তা হলেও খোকা বেশ বুঝতে পারল ওর ভেতরে লোক থাকে। একটু ভেতরের দিকের একটা কামরাতে টিমটিমে বাতি জ্বলছে– তারই একটুখানি আলো এসে পড়েছে রাস্তার ওপর। খোকা পা টিপে টিপে সেই আলো লক্ষ করে এগোলো।

খুব সন্তর্পণে পা ফেলে খোকা এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। জানালাটা বন্ধ। কিন্তু কাঠের ফাঁক দিয়ে চোখ রাখলে ঘরের ভেতরটা বেশ দেখা যায়। একবার দৃষ্টি দিয়েই শুকিয়ে উঠল খোকার অন্তরাত্মা।
দেখল ঘরের ভেতর একপাশে একটা ভাঙা লণ্ঠন জ্বলছে। আবছা আলোয় দশ-বারো জন লোক বসে আছে। তাদের সবাইকে ভালো করে দেখা যায় না। তবু যা দেখল তাতেই খোকার প্রাণ যায় যায়।

একটা লোক হতভম্বের মতো ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে আছে আর একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে সামনে, একজনের হাতে রিভলবার।
বাকি লোকগুলো ওকে ঘিরে রয়েছে।
চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটা বলছে, 'না, ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।'
রিভলবারধারী কঠিন দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'করতেই হবে তোমাকে। নইলে দেখতেই তো পাচ্ছ—!'
রিভলবারটা একবার নাড়ল সে।
'একটুও শব্দ হবে না, একেবারে আধুনিক যন্ত্র, সামান্য একটু হিস। তারপরেই ব্যস।'
কিন্তু লোকটার কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না, মনের বল তারও কম নয়।
নিরুত্তর বসে রইল লোকটা।
তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে অস্ত্রধারী আবার বলল, 'শোনো তেওয়ারি, আধঘণ্টা সময় দিলাম তোমাকে। এর মধ্যে মনস্থির করো। এই রইল কাগজ-কলম। শুধু একটা সই, নইলে আধঘণ্টা পরে আত্মারাম আর খাঁচায় থাকবে না।'
হঠাৎ চেতনা ফিরে এলো খোকার।
আর মাত্র আধঘণ্টা। আর মাত্র আধঘণ্টা। তার পরেই একটা প্রাণ চলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। খোকার মনের মধ্যে খেলে গেল হঠাৎ আলোর ঝলকানি। না, আর এখানে নয়, খোকা ভাবল। ত্রস্তে নেমে এল সে জানালা থেকে। পা টিপে টিপে গলি থেকে বেরিয়ে খোকা দিল এক দৌড়। এক দৌড়ে এসে পড়ল রাস্তার মোড়ে।
বগলে বই চেপে সে ভাবতে লাগল, কী করবে এখন। কোথায় যাবে? খোকার মনে হলো যেমন করেই হোক লোকটাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? স্কুলে থার্ড ক্লাসের ছাত্র সে। বয়স্ক লোক যদি হতো, বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সে নিজেই উদ্ধার করত লোকটিকে।
বড়ো রাস্তায় অনেক আলো। ভয় তার কেটে গেল অনেকটা। ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল সাহস।
হ্যাঁ, সাহস করে এগোতে হবে তাকে। এমন একটা কর্তব্য তাকে করতে হবে যা কতদিন ধরে সে কল্পনা করে এসেছে।
চট করে তার মনে পড়ে গেল তার প্রিয় বইয়ের অতি পরিচিত মানুষগুলোর কথা। সত্যেন ঘোষ। ডিটেকটিভ সত্যেন ঘোষ হওয়ার এটাই সুযোগ।
কিন্তু খোকা ভাবল সত্যেন ঘোষ তো বয়স্ক বুড়ো লোক। সে বরং তার সাগরেদ তরুণ সুব্রত হতে পারে। ঠিক। সে হলো সুব্রত। শক্তিমান, বলিষ্ঠ নির্ভীক সুব্রত। কোনো চালাকি তার কাছে খাটে না। প্রত্যেকটা খুনি তার কাছে ধরা পড়ে। যারা পড়ে না তারা অসাধারণ। কিন্তু খোকাকে এবারে সে দুঃসাহসিক কাজের বিবরণ পড়াই নয়,

এবার হাতে-কলমে এগোতে হবে। এতদিন সে বীরের কীর্তিকলাপের কাহিনি পড়েই এসেছে, এবার সে নিজেই বীর হবে।

কিন্তু এখন কী করা যায়? মাথায় তার বুদ্ধিও আসছে না। দীনেন রায়ের ব্লেক যদি এই অবস্থায় পড়তেন, তা হলে কর্তব্য ঠিক করতে তার এক মুহূর্তও দেরি হতো না। অথচ সময় খুব কম। না, আর দেরি করা চলে না। মাত্র আধঘণ্টা সময়, তার মধ্যে আবার পাঁচ মিনিট ইতোমধ্যেই কেটে গেছে।

তাই তো! লোকটাকে বাঁচাতে হবে যে! সেই আধঘণ্টা কাটবার আগেই আচমকা হানা দিয়ে লোকটাকে বাঁচাতে হবে মৃত্যুর কবল থেকে। সে ভাবতে লাগল সত্যেন ঘোষ এরকম অবস্থায় পড়লে কী করতেন। ভাবতে ভাবতে তার মনে হলো এমন অবস্থায় তার কর্তব্য হচ্ছে একজন ইন্সপেক্টার সঙ্গে করে সরাসরি ঘরে গিয়ে হানা দেওয়া। ঠিক।

কিন্তু ইন্সপেক্টার কোথায় থাকেন, তাও যে তার জানা নেই।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটা লোক। খোকা ভাবল, সমস্ত ব্যাপারটা একে খুলে বলাটা কেমন হবে?

বিপদ আছে তাতে। এসব আনাড়ি লোক হয়ত চেঁচামেচি করে সব মাটি করে দেবে। টের পেয়ে পাখি ততক্ষণে উড়েই যাবে।

তবে হ্যাঁ, ইন্সপেক্টারের খোঁজটা ওর কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। লোকটার সামনে গিয়ে সে খুব বুদ্ধিমানের মতো জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা এখন কয়টা বাজে বলতে পারেন?'

লোকটা একটু অবাক হলেন। তারপর হেসে বললেন, 'সাতটা।'

খোকা একটু ভাবল।

'আচ্ছা, পুলিশের ইন্সপেক্টার কোথায় থাকেন বলতে পারেন?'

'কেন খোকা! পুলিশের ইন্সপেক্টার দিয়ে কী করবে?'

লোকটার কথায় খোকার রাগ হয় খুব।

খোকা ভাবে, লোকটা পেয়েছে কী তাকে, কত বড়ো একটা কাজ করতে বেরিয়েছে সে। যদি সফল হয় তা হলে কালকের প্রভাতী সংবাদপত্রগুলোতে বড়ো বড়ো অক্ষরে তার কীর্তিকথা প্রচার করা হবে।

লোকটার কথার জবাবে খোকা বললে, 'আমার দরকার। কোনো ইন্সপেক্টারের ঠিকানা জানা থাকলে দয়া করে বলুন।'

ভদ্রলোক একটুখানি চুপ করে থেকে তাকে বললেন, 'কেন, তুমি থানায় গেলে তো পারো।'

কথাটা মনে ধরল তার। থানায় রওনা হলো খোকা।

লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে থানার পথ চিনে সোজা সে হাজির হলো থানার অফিসঘরে। সামনেই বসে ছিলেন ওসি।

দেখলেন বেশ একটা অল্পবয়স্ক ছেলে কী যেন বলবে মনে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খোকা, কী দরকার তোমার?'

আবার খোকা! মনে মনে বেজায় চটে গেল সে। কিন্তু মুখে শুধু বললে, 'অনেকগুলো লোক মিলে একটা লোককে খুন করছে।'

ওসির কাজই হলো অপরাধ যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। কাজেই তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠলেন।

'কোথায়? কেমন করে? তুমি কী করে জানলে?'

খোকা তাকে আদ্যোপান্ত ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে ওসি মাথা নেড়ে বললেন, 'তাই তো।'

খোকার তখন সাহস আরো বেড়ে গেল।

সে বলল, 'শিগগির চলুন। এতক্ষণে হয়ত লোকটাকে ওরা মেরেই ফেলেছে।'

ওসি তখন জনাদশেক কনস্টেবল নিয়ে একটা জিপে গিয়ে উঠলেন।

জিপ গাড়িটা ছুটে চলেছে। খোকার তখন কী আরাম। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছে খোকা। দুরু দুরু কাঁপছে তার বুক। কত বড়ো একটা অভিযানে চলেছে সে। তার মনে হয় ওদের জিপটা যদি অন্য একটা জিপকে অনুসরণ করত তাহলে বেশ হতো। শাঁই শাঁই করে বেরিয়ে যেত এক-একটা গাড়ি। অবশেষে অপরাধীর গাড়িটা ধরে ফেলত তারা।

সেই গলির মোড়টা এসে পড়তেই খোকা বলল, 'থামুন, এইখানে।'

হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সবাই।

খোকা বলল, 'সাবধানে পা টিপে টিপে আসুন, নইলে— ফুড়ুৎ।'

খুব সন্তর্পণে এগিয়ে সেই একতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল তারা। ভেতরে তখনও আলো জ্বলছে। আর ঘর থেকে ভেসে আসছে তুমুল হাসির সাড়া। জানালার কাছে এসে খোকা উঁকি মারল।

ওসিকে ফিসফিস করে বললো, 'ওই ওরা।' ওসি এদিক-ওদিক তাকিয়ে, দুয়ারে আঘাত দিল। ভেতর থেকে ভেসে এল কর্কশ কণ্ঠস্বর, 'কে?'

'দুয়ার খোল।'

দুয়ারটা পরক্ষণেই খুলে গেল। একটা লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী চান?'

খোকা দেখেই তাকে চিনতে পারল। সেই রিভলবারধারী।

'আরে এ যে দেখছি মমতাজ সাহেব।' ওসি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার?'

মমতাজ সাহেব বললেন, 'আমিও তো বলি কী ব্যাপার। আপনি যে হঠাৎ! তা আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।'

মমতাজ সাহেবের পিছু পিছু সকলে ঘরে ঢুকল। ওসি সারাটা ঘর একবার ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর চেয়ারের ওপর পড়ে থাকা কাগজপত্রগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন।

মমতাজ সাহেব ও তার সঙ্গীরা সকলেই তখন দারুণ হকচকিয়ে গেছেন। একসঙ্গে এত পুলিশ, দারোগা দেখে সকলের চোখ ছানাবড়া।

ওসির হাসি দেখে তারা ঘাবড়ে গেল আরো। ওসি তাদের ভয় ভাঙানোর জন্য বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। অসময়ে হানা দিয়ে আপনাদের কাজের ব্যাঘাত করলাম বলে। ব্যাপার কিছুই নয়। আমরা সবাই এসেছিলাম একটা অনুরোধ নিয়ে। আমরা যেন বাদ না পড়ি।'

মমতাজ সাহেব হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

তারপর কিছুক্ষণ খোশগল্প করে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আসার সময় খোকাকে শক্ত হাতের মুঠোয় চেপে ধরতে ভুললেন না ওসি।

বাইরে এসে খোকাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মোহন কখানা পড়েছ বল দিকি?'

খোকা বুঝতেই পারল না ওসি কী বলছেন।

এ আবার কেমন রহস্য, সে ভাবল।

'মাথাটা তো গুলে খেয়েছ। তোমাদের নিয়ে যে কী হবে, তাই আমি ভেবে পাই না।' পরে খোকাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলেন ওসি।

পরদিন সংবাদপত্রে বড়ো বড়ো অক্ষরে নিচের ঘটনাটি বেরুল :

গত ১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজামিত্র রোডের বাড়িতে আইঢাই অভিনেতা সঙ্ঘ যখন তাঁহাদের নূতন নাটকের মহড়া দিতেছিলেন তখন ফরাক্কাবাদের ওসির নেতৃত্বে একদল পুলিশ তথায় গিয়া হানা দেয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সৈফুদ্দীন ওরফে খোকাবাবু নামে এক বালক থানা পুলিশকে খবর দেয় যে, কিছু লোক মিলে অপর একটি লোককে খুন করিতে যাইতেছে। তাহারা সেই লোকটিকে কোনো একটি দলিলে স্বাক্ষর করিবার আদেশসহ আধঘন্টার সময় দিয়াছে, এই আধঘন্টার মধ্যে উক্ত দলিলে স্বাক্ষর না-করিলে তাহাকে রিভলবার দ্বারা হত্যা করিবার হুমকি দেওয়া হইয়াছে। বালকের নিকট হইতে এই মর্মে সংবাদ পাইয়া ফরাক্কাবাদের পুলিশ তথায় হানা দেয়। আরো জানা গিয়াছে যে, থানার ওসি তথায় গিয়া আইঢাই সংঘের প্রখ্যাত অভিনেতা মমতাজউদ্দিন সাহেবকে দেখিতে পান। ঘরের মধ্যে ঢোল, তবলা, পোশাক এবং একটি নাটকের পাণ্ডুলিপিও তিনি দেখিতে পান, পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠা ওলটাইয়া তিনি সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিতে পারেন। কিছুক্ষণ পূর্বে বালকটি যখন সেই পথ দিয়া অতিক্রম করিতেছিল, তখন নাটকের মহড়া চলিতেছিল, বালকটিকে ওসি বাড়ি পৌঁছাইয়া দেন। জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়া তাহার নিকট হইতে জানা যায় যে, গোয়েন্দা কাহিনি তাহার অত্যন্ত প্রিয়। মোট ১৮০ খানা মোহন সিরিজ, ১৮৯ খানা সেক্রটন ব্লেক, সবকটি কনান ডয়েল, নীহারগুপ্ত, পাঁচকড়ি দের সবখানা গোয়েন্দাগ্রন্থ সে ইতোমধ্যেই শেষ করিয়াছে। ছেলেটি আগাথা ক্রিস্টির নাম শুনিয়াছে, তবে ইংরেজি জানা না থাকায় এখনও শুরু করিতে পারে নাই।

লেখক-পরিচিতি

শহীদ সাবের ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম এ কে এম শহীদুল্লাহ। তিনি কিশোর বয়স থেকে সাহিত্যরচনা শুরু করেন। তাঁর প্রকাশিত রচনাসমূহ হলো— 'আরেক দুনিয়া থেকে'; ছোটোদের গল্প-সংকলন 'ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান'; গল্প-সংকলন 'এক টুকরো মেঘ'। তিনি অনুবাদ করেছেন কয়েকটি বিদেশি গল্প ও জীবনীগ্রন্থ। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ রাতের বেলা তাঁর কর্মস্থল 'সংবাদ' অফিসটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দিলে তিনি অগ্নিদগ্ধ হয়ে শহিদ হন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

সৈফুদ্দীন ওরফে খোকা স্কুলের থার্ড ক্লাসের ছাত্র। প্রচুর গোয়েন্দা-কাহিনি পড়ে ফেলেছে সে। একদিন স্কুল থেকে দেরি করে ফেরার সময় একটি পুরোনো বাড়িতে রহস্যজনক ঘটনার সন্ধান পায় সে। দেখে কয়েকজন ব্যক্তি মিলে একজনকে দলিলে স্বাক্ষর করতে বলছে; স্বাক্ষর না করলে আধঘণ্টার মধ্যে তাকে খুন করা হবে। লোকটিকে বাঁচাবার জন্য খোকা দ্রুত থানায় গিয়ে পুলিশে খবর দেয়। থানার ওসি কয়েকজন পুলিশ নিয়ে ছুটে যান সে বাড়িতে। দেখা যায়— সেখানে একটি পরিচিত নাট্যদলের নতুন এক নাটকের মহড়া চলছে। কিন্তু সেটি যে নাটকের মহড়া— খোকা তা বুঝতেই পারেনি। তাই সে মহড়ার একটি দৃশ্যে তার আগেই পড়া গোয়েন্দা-কাহিনির রহস্যের মিল খুঁজে পায়। নিজেকেও গোয়েন্দা-কাহিনির একটি চরিত্র কল্পনা করে নেয় সে। আসলে, বেশি গোয়েন্দা-কাহিনি পড়ার কারণে খোকা বাস্তব জীবনেও সেরকম ঘটনা কল্পনা করে নিয়েছে। আর তাই সৃষ্টি হয়েছে অতিকল্পনায় বিভোর কিশোর খোকার রহস্য-উন্মোচনের ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনি।

কোনো বিষয়েই সীমাহীন ঝোঁক বা নেশা কারো জন্য শুভফল বয়ে আনে না, এ সত্যই গল্পটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

ধড়াস — হৃৎস্পন্দনের প্রবল শব্দ।

সন্তর্পণে — অতি সাবধানে।

অন্তরাত্মা — মন, হৃদয়।

লণ্ঠন — কাচে ঘেরা প্রদীপ।

হতভম্ব — বুদ্ধি কাজ না-করা। প্রয়োজনে কী করতে হবে বুঝতে না-পারা।

রিভলবার — এক হাতের মুঠিতে ধরে চালানো যায় এমন বন্দুক জাতীয় ছোট অস্ত্র।

ভাবান্তর — অন্য ভাব। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ভাবভঙ্গি বা চিন্তার কোনো পরিবর্তন না-হওয়া অর্থে।

নিরুত্তর — উত্তরহীন।

আত্মারাম — প্রাণপাখি, প্রাণ।

ত্রাসে — ভয়ে।

থার্ড ক্লাস — সেকালে থার্ড ক্লাস বলতে এখনকার অষ্টম শ্রেণি বুঝায়।

ডিটেকটিভ — গোয়েন্দা।

সত্যেন ঘোষ — গোয়েন্দা উপন্যাসের একটি চরিত্র।

সাগরেদ — শিষ্য, সহকারী।

কীর্তিকলাপ — কৃতিত্বপূর্ণ কাজ, প্রশংসাযোগ্য কাজ।

ইনসপেক্টর — পরিদর্শক, পুলিশ পরিদর্শককে বোঝানো হয়েছে। ইংরেজি Inspector.

প্রভাতী সংবাদপত্র — সকালের খবরের কাগজ।

আদ্যোপান্ত — শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আদি ও উপান্ত যোগে আদ্যোপান্ত।

ওসি — থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। ইংরেজি Officer in-charge.

কনস্টেবল — পুলিশের প্রহরী।

হকচকিয়ে যাওয়া — ঘাবড়ে যাওয়া।

ছানাবড়া — দুধের ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টি। এখানে 'চোখ বড়ো' বা অবাক অর্থে।

খোশগল্প — আমোদজনক বা মজার আলাপ।

মোহন — দস্যু মোহন নামের একটি গোয়েন্দা সিরিজ গল্পের প্রধান চরিত্র।

গুলে খাওয়া — কঠিন ও তরল একাকার করে খেয়ে ফেলা।

হানা দেওয়া — আক্রমণ করা, তল্লাশির জন্য উপস্থিত হওয়া।

গোয়েন্দা-কাহিনি — রহস্য উন্মোচনমূলক কাহিনি। গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে রহস্য-উন্মোচনমূলক গল্প।

সেক্সটন ব্লেক — বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনির লেখক।

কনান ডয়েল — আর্থার কোনান ডয়েল। বিখ্যাত ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনির লেখক।

নীহার গুপ্ত — নীহাররঞ্জন গুপ্ত।

পাঁচকড়ি দে — বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির লেখক।

আগাথা ক্রিস্টি — ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনির লেখক।

বিভোর — আত্মহারা, অভিভূত।

দীক্ষা

মোহাম্মদ নাসির আলী

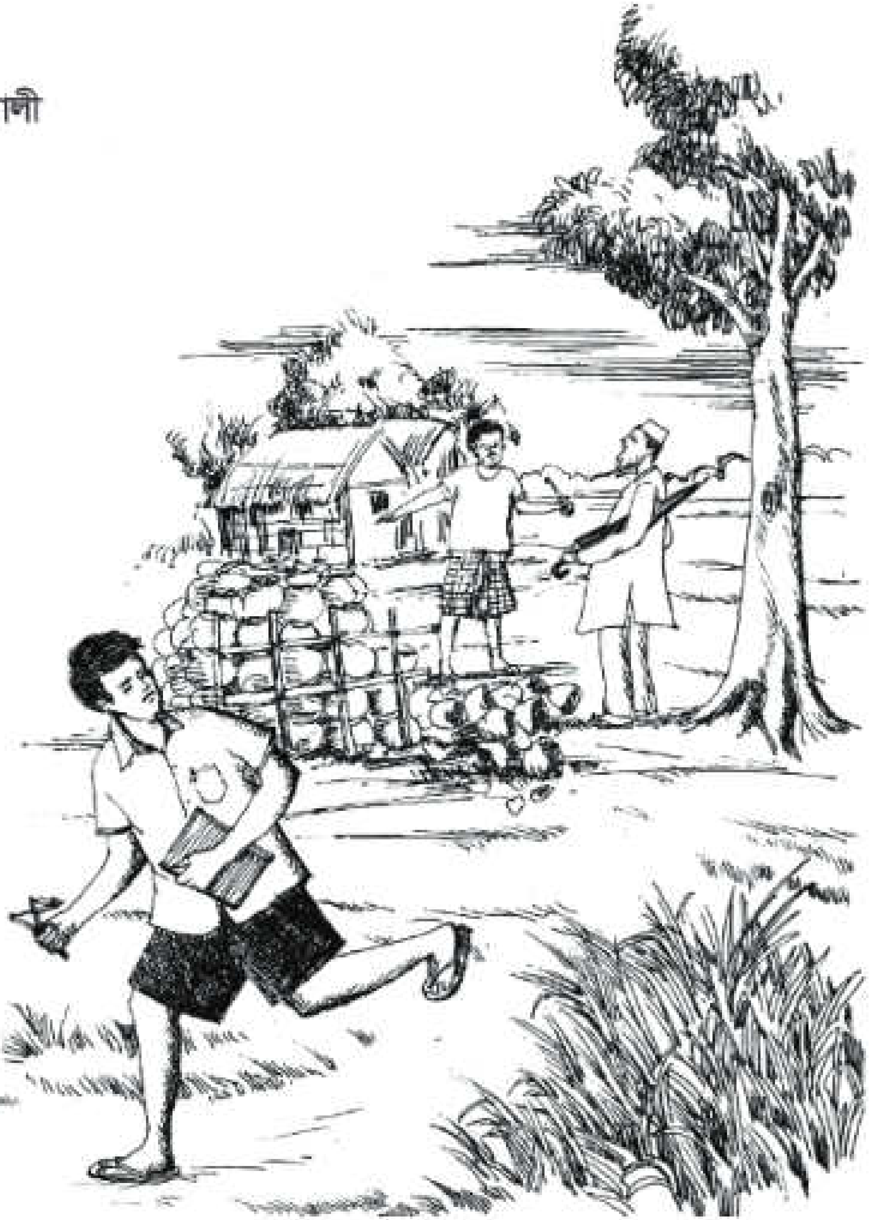

স্কুলে বরাবর বাংলা পড়ান সতুবাবু– সতীনাথ বোস। তিনি সেদিন গরহাজির। হেডমাস্টার মশাই তাই মৌলবি সাহেবকে ডেকে বললেন, 'সতুবাবু আজ আসেননি দেখছি! ফোর্থ ক্লাসে আজকে বাংলার পিরিয়ডটা আপনিই কোনো রকমে চালিয়ে দিনগে, কেমন?'

'জি, আচ্ছা।' বলে মৌলবি সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। রাজি হলেন সত্যি কিন্তু মনে-মনে প্রমাদ গুনলেন। একে তো পড়াতে হবে বাংলা, তা-ও আবার ফোর্থ ক্লাসে অর্থাৎ দুষ্টের শিরোমণি লেবুদের ক্লাসে।

মৌলবি সাহেব সরল গোবেচারি গোছের লোক। ধর্মপ্রাণ এই নিরীহ লোকটিকে স্কুলের শিক্ষক-ছাত্র প্রায় সবাই ভক্তিশ্রদ্ধার চোখে দেখত, তা ছাড়া একটু ভয়ও করত। ভয়ের কারণ, স্বয়ং হেডমাস্টার মশাইও মৌলবি সাহেবকে সমীহ করে চলতেন। অনেক কাজেই তিনি মৌলবি সাহেবের পরামর্শ নিতেন।

কিন্তু মৌলবি সাহেব নিজে মনে-মনে ভয় করতেন লেবুকে। ফোর্থ ক্লাসে ফারসি পড়াতে গিয়ে লেবুর নিত্যনতুন উৎপাতের জ্বালায় তিনি অস্থির থাকেন। তার ওপর আজ আবার পড়াতে হবে বাংলা। গোলমাল এড়ানোর জন্য তিনি তাই ক্লাসে ঢুকেই এক বুদ্ধি আঁটলেন। বললেন, 'আজকে ক্লাসে সংক্ষিপ্ত একটি রচনা লিখতে দিচ্ছি তোমাদের: মনে করো, পাঁচশো করে টাকা দিলাম তোমাদের সবাইকে। সেই টাকা দিয়ে কে কী করবে লিখে দেখাও। কোনোরকম গোলমাল করবে না, আগেই বলে রাখছি।'

খাতা-পেনসিল নিয়ে রচনা লিখায় মনোযোগ দিল সবাই। লেবু এককোণ থেকে উঠে বলল, 'পাঁচশো করে প্রতিজনকে দিলে সে যে অনেক টাকার ব্যাপার, স্যার। দু-পাঁচ হাজারেও কুলোবে না! এত টাকা দিয়ে ফেলবেন স্যার? কিছু কমিয়ে দিলেই তো ভালো।'

লেবুর এ অবান্তর উক্তিতে মৌলবি সাহেব মনে-মনে রেগে গেলেন। বাইরে তা প্রকাশ না-করে বললেন, 'যাকে বলে হোপলেস ছেলে, তুমি হয়েছ তা-ই। বললেই কি আর দেওয়া হলো? বললাম তো, মনে করে নাও পাঁচশো করে টাকা তোমরা পেলে।'

'ওহো, তা-ই বলুন, মনে করতে হবে পাঁচশো করে টাকা আপনি দিলেন, বেশ।' বলেই লেবু এক-মিনিটে কী যেন লিখে খাতা উলটে রাখল। মৌলবি সাহেবের তা দৃষ্টি এড়াল না।

ঘণ্টা বাজবার আগেই সবার রচনা লেখা শেষ হলো। মৌলবি সাহেব খাতা দেখতে লাগলেন। কেউ লিখেছে, টাকা পেয়ে ব্যবসা করবে, কেউ দান করবে। কেউ-কেউ লিখেছে, গাঁয়ে স্কুল করে দেবে, গরিব ছেলেমেয়েরা সেখানে বিনা বেতনে পড়বে। কিন্তু লেবু লিখেছে চমৎকার। দু-চার কথায় রচনা তার শেষ। লিখেছে, 'কম টাকা হইলে বিশেষ চিন্তাভাবনা করিয়া খরচ করিতাম। পাঁচশত টাকা পাইলে নিশ্চিন্তে পায়ের ওপর পা তুলিয়া বসিয়া খাইব।'

এবার আর মৌলবি সাহেব রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। লেবুর কান টেনে দিয়ে বললেন, 'খাওয়াচ্ছি তোমাকে পায়ের ওপর পা তুলে। এসব কী লিখেছ, হোপলেস কাঁহাকা'— বলেই পিঠের ওপর দু ঘা বসাতে যাবেন, এমন সময় দফতরি এল একটা নোটিশ নিয়ে। হেডমাস্টারের নোটিশ— টিফিনের ঘণ্টা শুরু হলে পাঁচ মিনিটের জন্য সবাইকে হাজির হতে হবে কমনরুমে।

লেবুকে রেহাই দিয়ে মৌলবি সাহেব ছেলেদের নোটিশের মর্ম বুঝিয়ে দিলেন।

টিফিনের ঘণ্টায় প্রায় সবাই এসে জড়ো হলো কমনরুমে। হেডমাস্টার মশাই বলতে লাগলেন, 'চণ্ডীতলা ঘোষেদের বাড়ির পাঠশালার বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই বামাপদবাবুকে তোমরা সবাই জানো, আশা করি। তোমাদের অনেকেই তাঁর ছাত্র। তাঁর পাঠশালায় পড়ে এখানে এসেছ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি তোমাদের নামে আজ এক গুরুতর অভিযোগ করে পাঠিয়েছেন। তোমরা নাকি তাঁর ছাত্রদের অহেতুক ঠাট্টাবিদ্রূপ করো। তার নমুনাও তিনি পাঠিয়েছেন। পাঠশালার দেয়ালে কে যেন ছাত্রদের নামে খড়ি দিয়ে লিখে রেখেছে :

বামা পণ্ডিতের পাঠশালা
বিদ্যে হয় না কাঁচকলা—
দুহাতে দুই কলম দিয়ে
বসিয়ে রাখে গাছতলা।

অভিনব এ ছড়া শুনে ছাত্ররা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। হেডমাস্টার আবার বললেন, 'আমার দৃঢ় ধারণা, এ ছড়ার রচয়িতা তোমাদের ভেতরই রয়েছে। কে সেই কবিবর তা স্বীকার করলে কিছুই আমি বলব না তাকে, শুধু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দেব। তা না-হলে বুঝতেই পারছ, অপরাধীকে বের করে কঠিন সাজার ব্যবস্থা করতেই হবে আমাকে।'

তিনি চুপ করলেন। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এমন সময় মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়াল লেবু। বলল, 'এ অন্যায় কাজ আমিই করেছি স্যার। অন্যায় বলে তখন বুঝতে পারিনি।'

কার যে এ কাজ হেডমাস্টার মশাই আগেই তার কিছুটা আঁচ করে রেখেছিলেন। অনুমানটা তাঁর সত্যিই হয়েছে দেখা গেল। এবার তিনি বললেন, 'অন্যায় করেছ এবং তা স্বীকার করবার সৎসাহস তোমার আছে দেখে এবার আমি কিছুই বললাম না। গুরুজনদের নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা খুবই অন্যায়, বুঝতেই পারছ। কাজেই বলে রাখছি, ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের অন্যায় তোমরা করেছ বলে শুনতে না পাই। আর হ্যাঁ, আরেকটা কাজ তোমাকে করতে হবে। কালকে স্কুলে আসবার পথে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসতে হবে তোমাকে। পারবে তো?'

'খুব পারব স্যার।'

'বেশ, থ্যাঙ্ক ইউ। তোমরা সবাই এবার টিফিনে যেতে পার। টিফিনের পরে লেবু আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে দেখা করে যেয়ো।' বলে তিনি চলে গেলেন।

একটু পরে লেবু এসে লাইব্রেরিতে ঢুকলে তিনি বললেন, 'কাল থেকে তুমি মৌলবি সাহেবের সঙ্গে স্কুলে আসবে– কক্ষনো একলা আসবে না বলা রইল। একথা বলার জন্যই তোমাকে আসতে বলেছিলাম। আচ্ছা, এবার তুমি যেতে পারো।'

লেবু চলে গেল। এ নতুন ব্যবস্থাটা কিন্তু মৌলবি সাহেবের মোটেই মনমতো হলো না। তিনি প্রকাশ্যেই বললেন, 'আমার ঘাড়ে আবার এই ইবলিশটাকে চাপালেন কেন হেডমাস্টার মশাই?'

হেডমাস্টার মশাই হেসে বললেন, "ইবলিশ বলুন আর যা-ই বলুন, ছেলেটা কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট। এ ধরনের ছেলেদের বলতে পারেন, 'অ্যাবাভ অ্যাভারেজ' সাধারণের ব্যতিক্রম। সুযোগ পেলে, সুপথে চালিত হলে এরাই একদিন মানুষের মতো মানুষ হয়।"

এরপর মৌলবি সাহেব আর দ্বিরুক্তি করা সঙ্গত মনে করলেন না। মৌলবি সাহেব ভিন্ন জেলার লোক। লেবুদের পাড়ায় কাজিবাড়িতে জায়গির থাকেন। এ ব্যবস্থার পর থেকে লেবুকে রোজই মৌলবি সাহেবের সঙ্গে স্কুলে আসতে হয়– পথে কারও সঙ্গে দুষ্টুমি করার তেমন সুযোগ আর হয় না।

কিছুদিন পরে স্কুলে শুরু হয়েছে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা। রুটিনমাফিক পরীক্ষার শেষের দিনে মৌলবি সাহেবের ওপর ভার পড়েছে ফোর্থ ক্লাসে গার্ড দেবার। সবাইকে বাদ দিয়ে লেবুর ওপর তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। রাতদিন দুষ্টুমি আর বাঁদরামি করে ছেলেটি পরীক্ষায় কী করে ভালো নম্বর পায়, সে রহস্য তিনি ভেদ করবেন। নিয়মিত পড়াশোনা না করেও ভালো নম্বর পাবার সহজ পথ হলো পরীক্ষার সময় নকল করা। লেবু যা ছেলে, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

আড়চোখে কিছুক্ষণ লেবুর হাবভাব লক্ষ করে মৌলবি সাহেবের মনে হলো অনুমানটা তাঁর যেন মিথ্যে নয়। লেবু কিছুক্ষণ পরপরই বুকপকেটটা বাঁ হাতে আঙুল দিয়ে ফাঁক করে কী যেন দেখে নিচ্ছে, তারপর আবার লেখায় মন দিচ্ছে।

১০৩৫

ব্যাপারটা দু-একবার দেখেই মৌলবি সাহেব লেবুর কাছে এসে হঠাৎ বললেন, 'দেখি তোমার জামার পকেটে কী আছে?'
লেবু আমতা আমতা করে বলল, 'ও কিছুই না স্যার।'

'কিছুই না কী রকম দেখি।' বলেই তিনি বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করলেন সিগারেটের একটা প্যাকেট। আর যায় কোথায়! মৌলবি সাহেব বলে উঠলেন, 'ছেলের এ বিদ্যেও হয়েছে দেখছি! সাধে কী আর হোপলেস বলি!'
বলেই তিনি সিগারেটের প্যাকেটটা যেমনি খুলেছেন অমনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। হঠাৎ তিনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন।

ব্যাপারটা হলো— সিগারেটের খালি প্যাকেটটার ভেতর ছিল কয়েকটা আরশোলার বাচ্চা। স্কুল ছুটির পরেই পুকুরে ছিপ ফেলে মৎস্য শিকারের আয়োজন করেছে লেবু আগে থেকেই। আরশোলাগুলো হলো বড়শির টোপ। হঠাৎ মুক্তি পাওয়ার আশায় আনন্দে একটা আরশোলা গিয়ে আশ্রয় খুঁজতে লাগল মৌলবি সাহেবের গলার কাছে দাড়ির নিচে। সেটাকে কাবু করার আগেই দু-তিনটা ঢুকে পড়ল তাঁর পাঞ্জাবির ঢোলা আস্তিনের ভেতর। সটান ভেতরে গিয়ে উঠল। ভালো করে ব্যাপারটা বুঝবার আগেই ঊর্ধ্ববাহু মৌলবি সাহেব তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন। বে-দিশা হয়ে লাফাতে লাফাতে তিনি পড়লেন গিয়ে পাশের একটি ছেলের ডেস্কের ওপর। ডেস্কের দোয়াত-কলম সব উলটে পড়ল গিয়ে ছেলেটার কোলে। কালি পড়ে জামাকাপড়, পরীক্ষার খাতা সব একাকার হয়ে গেল। মৌলবি সাহেবের সেদিকে খেয়াল করার ফুরসত নেই। তিনি তখনও কেবলই লাফাচ্ছেন।

আসল ব্যাপার কিছুই বুঝতে না-পেরে অবাক ছেলেরা হাঁ-করে চেয়ে আছে কলম তুলে। পাশের কামরা থেকে সতুবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন তাই রক্ষা। জামার নিচে হাত গলিয়ে অতি কষ্টে তিনি আরশোলা কটা বের করলেন। এতক্ষণ পরে নিষ্কৃতি পেয়ে মৌলবি সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, 'হোপলেস, সতুবাবু, একেবারেই হোপলেস। পকেটে করে নিয়ে এসেছে কি-না তেলাপোকা। যতসব হোপলেস বে-আদব।'
সতুবাবু অতি কষ্টে হাসি চেপে বেরিয়ে গেলেন।

ছুটির পর লেবুর ডাক পড়ল হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে। তার পেছনে পেছনে গেল আর সব ছেলে। কোনো রকম ভূমিকা না করেই লেবুকে হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'পকেটে করে ওগুলো এনেছিলে কেন?'
নিরুত্তর লেবু নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।
তিনি আবার তাড়া দিয়ে উঠলেন, 'কী হে, কথার জবাব দিচ্ছ না যে?'
কিছুক্ষণ পর লেবু বলে উঠল, 'আমার তো কোনও দোষ নেই, স্যার। উনিই তো ইচ্ছে করে আমার পকেট থেকে টেনে এগুলো বের করলেন।'
'তা বুঝেছি, কিন্তু তুমি কেন ওগুলো পকেটে করে স্কুলে এনেছিলে?'
পুকুরে ছিপ ফেলবার কথাটা গোপন করে লেবু বলল, 'আরশোলা পুষব বলে ধরে এনেছিলাম স্যার।'
লেবুর কথা শুনে সবাই একযোগে হেসে উঠল।

হেডমাস্টার বললেন, 'দুনিয়ার আর কোনো জিনিস পেলে না পুষতে, তাই আরশোলা পুষতে সাধ হয়েছে। তোমাকে আমি আরশোলা পোষাচ্ছি। ঘরের ওই কোণে আরশোলা আছে। যাও, ওখানে দেয়ালমুখো দাঁড়িয়ে থাকোগে। আধঘন্টা পর তোমার ছুটি।'
মিনিট পাঁচেক পরে মৌলবি সাহেব ছাতা হাতে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তা-ই দেখে লেবুর মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি এসে গেল। হেডমাস্টারকে সে বলল, 'স্যার, এখন রোজ স্কুলে আসবার সময় মৌলবি সাহেবের সঙ্গে আসি।'
'হ্যাঁ, তা তো আমার জানাই রয়েছে।'
'কিন্তু— কিন্তু যাবার সময়...'

লেবু কী বলতে চাইছে হেডমাস্টার মশাই তা সহজেই বুঝে ফেললেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অতি কষ্টে হাসি চেপে তিনি বলে উঠলেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। স্কুলে আসওয়ার সময় পাহারাধীনে এলে যাবার সময়ও সে-ব্যবস্থা হবে না কেন, এই তো বলতে চাইছ? যুক্তি যে তোমার অকাট্য তা মানতেই হবে। যাও, কিন্তু পথে দুষ্টুমি কোরো না। আর তা ছাড়া মৌলবি সাহেবকে, যাঁকে সবাই আমরা মান্যগণ্য করি, তাঁকে বিরক্ত করতে যেয়ো না।'
'আচ্ছা স্যার'— হেডমাস্টারের কথায় সায় দিয়ে লেবু বেরিয়ে গেল। কিন্তু যেতে যেতে ভাবতে লাগল মানুষ নিজে যা মনে করে সবসময় তা ঘটে কি? অঘটন তো কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ঘটে না। আজকের ব্যাপারটা কি লেবুর ইচ্ছায় ঘটেছে? লেবু কি চেয়েছিল মৌলবি সাহেব তাকে সন্দেহ করবেন আর পকেট থেকে আরশোলার বাক্সটা টেনে বের করবেন? অথবা তিনি কি মনে করেছিলেন ওটা খুললেই এমন বিপদ ঘটবে?

লেবুদের বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে একটা ছোটো খাল পার হতে হয়। খাল পেরিয়েই কুমোরপাড়া। পাড়াটার গা-ঘেঁষে চলে গেছে পায়ে-চলা সরু পথ। সময় বাঁচানোর জন্য সোজা পথে যেতে হলে এটাই সে পথ। মৌলবি সাহেবের সঙ্গে এ পথেই সেদিন লেবু যাচ্ছিল স্কুলে। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল একটা কাঠবিড়ালি। কাঠবিড়ালিটা মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে কী যেন মুখে দিচ্ছিল। লেবুর জন্য সুবর্ণ সুযোগ। মুহূর্তে সে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল। পকেট হাতড়ে দেখল, রবারের ছোট গুলতিটা ঠিকই আছে, মাটির তৈরি গুলিও আছে দু-তিনটা। কাঠবিড়ালি শিকারের এমন সুযোগ হেলায় হারানো যায় না। মৌলবি সাহেবের দৃষ্টি এড়িয়ে এক মুহূর্তে সে তার গুলতিটার সদ্‌ব্যবহার করে ফেলল।

আমগাছটার ঠিক পাশেই স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে কুমোরদের অনেকগুলো মেটে হাঁড়ি-পাতিল। বেচারা লেবুকে হতাশ করে দুষ্টু কাঠবিড়ালি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল গিয়ে আমগাছের ডগায়; এদিকে লেবুর লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা লাগল গিয়ে একটা হাঁড়ির গায়ে। গাছের নিচে সেই হাঁড়িটা যেই ভেঙেছে অমনি স্তূপের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল আরো পনেরো-বিশটা হাঁড়িপাতিল, সবকটাই ভেঙে চুরমার। পলকে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল। আওয়াজ হলো যেন একটা বোমা ফাটল এইমাত্র।

কীসে কী হলো মৌলবি সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। পিছনে চেয়ে দেখলেন, লেবু ততক্ষণে হাওয়া। কুমোরবাড়ি থেকে চিৎকার করে ছুটে এল আধপাগলাগোছের একটা লোক। এসে সামনেই পেল মৌলবি সাহেবকে। হাঁড়ি ফাটার শব্দে হতভম্ব হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটা এসেই তাঁর লম্বা কোর্তার খুঁট টেনে ধরল। বলল, 'চাইয়া দেখবার লাগছেন কী, দাম না-দিলে যাইতে দিমু না।'

মৌলবি সাহেব আরও হতভম্ব। তিনিও রেগে বলে উঠলেন, 'কাপড় ছেড়ে কথা বলো বে-আদব কাঁহাকা। তোমার হাঁড়ি কি আমি ফাটিয়েছি যে দাম দেবো?'
কিন্তু কার যুক্তি কে শোনে? আধ-পাগলা লোকটা নাছোড়বান্দা। বলে উঠল, 'একটা ছেইলারে লইয়া রোজ-রোজ আপনে স্কুলে যায়েন না এহান দিয়া? হেই ছেইলাডার এই কাম। হেই তো গাছের থনে দৌড় মারছে, দেখছি সব।'
পেছনের একটা বাড়ির আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে লেবু সব দেখছিল। একেই বলে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। অবশেষে মৌলবি সাহেব অতগুলো হাঁড়ির দাম নগদ দিতে না পেরে হাতের ছাতাটা বাঁধা রাখলেন। ছাতা বাঁধা রেখে স্কুলের পথ ধরলেন। বললেন, দু দিন পর মাইনে পেলে ছাতাটা ছাড়িয়ে নেবেন।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতে মৌলবি সাহেবের হাতে থাকত ওই একটা ছাতা, কাঁধে হলদে সুতোর বুটাতোলা বড়ো একখানা রুমাল। প্রয়োজনের সময় যা ব্যবহৃত হতো জায়নামাজ হিসেবে। বলতে গেলে এ দুটি বস্তু ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। আজই প্রথম দেখা গেল স্কুলের পথে মৌলবি সাহেবের কাঁধে রুমালখানা আছে কিন্তু হাতে ছাতাটি নেই।
এদিকে ভিন্ন পথে এসে লেবু কিন্তু চুপচাপ বসে ছিল তার ক্লাসে। বসে বসে মুহূর্ত গুনছিল কোন সময় তার ডাক পড়বে হেডমাস্টারের কামরায়। কিন্তু কী আশ্চর্য, ডাক পড়ল না। ফারসি পড়াতে ক্লাসে এসে মৌলবি সাহেব নিজেও কিছু বললেন না। স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে আজ বড়ো বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।
লেবুর মনটা হঠাৎ ভরে গেল মৌলবি সাহেবের প্রতি সহানুভূতিতে। অনুতাপও কম হলো না তার। বাড়ি গিয়েও সে মনে শান্তি পেল না।
পরের দিন।
স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। লেবুর পা নড়ছে না আজ কাজিবাড়ি গিয়ে মৌলবি সাহেবের সামনে দাঁড়াতে। তবু এক-পা দু-পা করে নিতান্ত অপরাধীর মতো সে এগিয়ে গেল। অপরাধীর মতোই সে কাছারি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল, বুড়ো কাজি সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন মৌলবি সাহেব। বলছেন, 'মাস্টারি কাজ আর ভালো লাগছে না। এর চেয়ে গাঁয়ে গিয়ে চাষবাস করাও ভালো। কাল বাড়ির চিঠি পেলাম— ছেলেপিলেরা ভুগছে অসুখে-বিসুখে। তার ওপর আবার বিপদ দেখুন, বাপদাদার আমলের সামান্য একটু জোতজমি ছিল, তা-ও নিলামে উঠতে চলেছে বাকি খাজনার দায়ে। এই চাকরি করে দূরে থেকে কত দিক আর সামলাব!'
বলতে বলতে বাইরে এসে দেখলেন, লেবু দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বললেন, 'আজ আর স্কুলে যাব না লেবু। মনটা তেমন ভালো নেই। এই দরখাস্তটা দিয়ো হেডমাস্টার মশাইকে।'
হঠাৎ লেবু বলে উঠল, 'আমাকে মাফ করুন স্যার। আমি আর দুষ্টুমি করব না।'
মৌলবি সাহেব লেবুকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'না লেবু, তুমি তো ইচ্ছা করে কোনো অন্যায় করনি— সবই ঘটনাচক্রে ঘটে গেছে। তোমরা ভালো হবে, মানুষ হবে, এই তো আমাদের কামনা।'
লেবু যেন মৌলবি সাহেবের কাছ থেকে সেদিন এক নতুন দীক্ষা গ্রহণ করল।

লেখক-পরিচিতি

মোহাম্মদ নাসির আলী ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ধাইদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার শিশু বিভাগের পরিচালকের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'নওরোজ কিতাবিস্তান' নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– 'মণিকণিকা', 'শাহী দিনের কাহিনী', 'ছোটদের ওমর ফারুক', 'বোকা বকাই', 'লেবু মামার সপ্তকাণ্ড' ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

স্কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র লেবু। শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছে সে দুষ্টের শিরোমণি হিসেবে পরিচিত। নানা ধরনের উৎপাত ও দুষ্টুমির কারণে সবাই তার নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করত। একবার চণ্ডীতলার এক পাঠশালার দেয়ালে আপত্তিকর ছড়া লেখার অভিযোগ পেয়ে হেডমাস্টার সব ছাত্রকে ডেকে জানতে চাইলেন, কে এই কাজ করেছে। লেবু দাঁড়িয়ে সেই অন্যায় কাজের দায় স্বীকার করল। তার এই সৎসাহস দেখে হেডমাস্টার খুশি হলেন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, সে যেন আর একা একা স্কুলে না আসে। মৌলবি সাহেবের সঙ্গেই প্রতিদিন স্কুলে আসার নির্দেশ দিলেন। লেবু পড়ল বিপদে। মৌলবি সাহেবের সঙ্গে আসার পথে সে কারো সঙ্গে দুষ্টুমি করার সুযোগ পেত না। তবে একদিন ঘটল অঘটন। কুমোরপাড়ার পাশ দিয়ে যাওয়া সময় লেবুর চোখে পড়ল এক কাঠবিড়ালি। কাঠবিড়ালিটি শিকার করতে গেলে ভেঙে পড়ল পনেরো-বিশটি হাঁড়ি। এ অবস্থা দেখে লেবু দৌড়ে পালাল। কিন্তু কুমোরপাড়া থেকে এক লোক এসে ধরল মৌলবি সাহেবকে। হাঁড়ির দাম হিসেবে বেচারা মৌলবি সাহেব বাঁধা রাখলেন নিজের ছাতাটা। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে লেবুর অনুতাপ হলো। পরদিন সে মৌলবি সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল। মৌলবি সাহেব তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। শিক্ষকের এই মহানুভবতা লেবুকে বদলে দিল।

নিছক আনন্দ যেমন মানুষকে বিপদে ফেলে, ক্ষমা এবং আন্তরিকতা তেমন মানুষকে সুপথে নিতে পারে।

শব্দার্থ ও টীকা

গরহাজির	— অনুপস্থিত।
ফোর্থ ক্লাস	— সেকালে ফোর্থ ক্লাস বলতে এখনকার সপ্তম শ্রেণি বোঝায়।
মৌলবি	— ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ, মুসলিম পণ্ডিত।
প্রমাদ	— বিপদের আশঙ্কা।
উৎপাত	— উপদ্রব।
অবান্তর	— অপ্রাসঙ্গিক, মূল প্রসঙ্গের বহির্ভূত।
হোপলেস	— আশাহীন, নির্বোধ। ইংরেজি Hopeless.
কোঁথাকা	— কোথাকার।
ইবলিশ	— শয়তান।
ইন্টিলিজেন্ট	— বুদ্ধিমান, জ্ঞানী।
দ্বিরুক্তি	— দ্বিতীয়বার উক্ত, দ্বিতীয় দফায় উল্লেখ।

জায়গির	— বিনা খরচে কোনো পরিবারে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।
হাফ-ইয়ার্লি	— অর্ধ-বার্ষিক। ইংরেজি Half-yearly.
টোপ	— বরশিতে গাঁথা মাছের খাদ্য।
আস্তিন	— কোট বা জামার হাতা।
বে-দিশা	— দিশাহারা।
নিষ্কৃতি	— মুক্তি, অব্যাহতি।
গুলতি	— মাটির ঢিল ছোড়ার ধনুকবিশেষ।
মেটে	— মাটি দ্বারা নির্মিত।
উদোর পিণ্ডি-বুধোর ঘাড়ে	— একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো।
কাছারি ঘর	— বিচারালয়, অফিস, বৈঠক ঘর।
দরখাস্ত	— আবেদন, আরজি।
দীক্ষা	— উপদেশ, শিক্ষা।

পদ্য লেখার জোরে

মাহমুদুল হক

এক দেশে ছিলেন এক বাদশাহ। হাতি-ঘোড়া সেপাই-সান্ত্রি কোনোকিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। বাদশাহর নাম শমশের আলীজান।

কোনো এক সময় বাদশাহ খুব অসুবিধায় পড়লেন। তাঁর নামের সঙ্গে মিলে যায় রাজ্যে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ছুতোর, কামার, গাছকাটা শিউলি এদের সকলের নামও শমশের। গোটা রাজ্য শমশেরময় হয়ে আছে এককথায়। তাই বাদশাহ একদিন উজির-নাজির, পাত্র-মিত্র, সভাসদ সবাইকে ডেকে দরবারে ঘোষণা করলেন– আমার ক্ষমতা তোমাদের সকলের চেয়ে খুব কম করে হলেও তিন গুণ বেশি; সুতরাং আজ থেকে আমার নামকে তিন দিয়ে গুণ করে ঠিক এইভাবে উচ্চারণ করতে হবে–

শমশের

শমশের

শমশের আলীজান

এই ঘোষণায় বিশেষ করে উজির আক্কেল আলী খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'বাদশাহ নামদার দীর্ঘজীবী হউন।'

উজির আক্কেল আলী ছিলেন বাদশার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। তাঁর ওপর বাদশাহর বিশ্বাসও অগাধ। বাদশাহ ধরে নিয়ে আসতে বললে তিনি বেঁধে নিয়ে আসেন। বাদশাহ হাঁচলে-কাশলে তিনি ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

একদিন হয়েছে কি, বাদশাহ উজিরকে সঙ্গে নিয়ে তিনমহল প্রাসাদের পাশ কাটিয়ে হাওয়া খেয়ে বেরোবার সময় দেখেন প্রাচীরের গায়ে একরাশ হিজিবিজি লেখা। বাদশাহ বললেন, 'দাঁড়াও, পড়ে দেখা যাক।'

আক্কেল আলী আক্কেল আলী
দেব তোরে কী,
ঘুমের ঘোরে চাঁদিতে তোর
গাঁট্টা মেরেছি।

উজির গরগর করতে করতে বললেন, 'এ্যাঁ, এ কি সত্যি কথা?'

বাদশাহ বললেন, 'খেপেচো নাকি। কেউ ঠাট্টা করে লিখেছে আর কি!'

বাদশার কথা শেষ হতে না-হতেই উজির চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, 'কী সব্বোনাশ! ওই দেখুন বাদশাহ নামদার, বাঁ দিকের প্রাচীরে আপনার নামেও কী কথা সব লিখে রেখেছে।'

বটে বটে, বলে বাদশাহ পড়ে দেখলেন—

শমশের
শমশের
শমশের আলীজান,
আমরুল
জামরুল
কচু ঘেঁচু সবই খান।
শমশের
শমশের
শমশের আলীজান,
খিটখিটে
মিটমিটে
শকুনের মতো জান।

রাগে আগুন হয়ে বাদশাহ বললেন, 'দেখেছ কী ওটা? আমার জান বলে শকুনের মতো। এ্যাঁ এত বড়ো কতা!'

উজির বললেন, 'শূলে চড়াব বাদশাহ নামদার, শূলে চড়াব! যদি না-পারি আমার নাম আক্কেল আলীই নয়। ইশ, কী বিচ্ছিরি কতা!'

এরপর অন্যান্য দিনের মতো বাদশাহ দরবারে বসলেন। বললেন, 'কার কী আর্জি আছে পেশ করো।' নাজির উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাদশাহ নামদার, আমার নামদার, আমার বাড়ির উঠোনে আজ সকালে একটা ঘুড়ি উড়ে এসে পড়েছিল, তাতে সব বাজে বাজে পদ্য লেখা।'

বাদশাহ গম্ভীরভাবে বললেন, 'কী লেখা ছিল? উজির আবৃত্তি করে বললেন—

শমশের শের নয়
লেজকাটা হনুমান,
বিড়ালের ডাক শুনে
দেন তিনি পিটটান।
কাঁঠালের মতো মাথা
আক্কেল আলীটার
ঘাসখেগো বুদ্ধি এন্তার এন্তার।

সকলে গাম্ভীর্য বজায় রাখবার জন্য মুখ নিচু করে থাকল।

সভাসদদের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি আবৃত্তি করতে শুরু করে দিলেন—

তিনগুণ শমশের পেল্লায় ভুঁড়ি
দশগুণ বোকামিতে দেয় হামাগুড়ি।
খাঁদানেকো টাকমাথা আকুশ কাঠ
বিশগুণ লোভে টেকো ঘোরে মাঠ-ঘাট।

বাদশাহ খেপে উঠে বললেন, 'তার মানে? তোমরা সব পাল্লা দিচ্ছ নাকি?'

সভাসদ বললেন, 'বাদশাহ নামদার বেয়াদবি মাফ করবেন, আজ সকালে আমার বাড়ির সামনেও একটা ঘুড়ি এসে পড়ে, তাতে লেখা ছিল ওইসব।'

বাদশাহ বিরক্ত হয়ে সেদিনকার মতো দরবার ভেঙে দিলেন।

পরদিন উজির দরবারের দিকে আসবার পথে দেখেন গাছের ডালে ঝুলছে রঙিন এবং বেশ বড়ো একটা ঘুড়ি। ঘুড়িটার ওপর রং দিয়ে তাঁর মুখ খুব বিশ্রীভাবে আঁকা। আর তাতে লেখা :

আক্কেল আলী উজির বটে
কুলোপানা কান
পেটের পিলে বাড়ছে কেবল
গোলায় বাড়ে ধান।

উজির তক্ষুনি বাদশাহর কাছে ছুটলেন। বললেন, 'কাঁহাতক আর সহ্য করা যায় বাদশাহ নামদার, একটা বিহিত করতেই হবে।' বাদশাহ বললেন, 'আজ থেকে রাজ্যময় আইন জারি করা গেল, ঘুড়ি ওড়ানো আর তৈরি করা দুটোই বন্দো। যারা মানবে না, তাদের হাত কেটে দেওয়া হবে, হাত।' উজির বললেন, 'খাসা আইন হয়েছে বাদশাহ নামদার। এইবার বাছাধনেরা জব্দ হবে, অ্যাঁ!'

পরদিন দেখা গেল শাহিমহলের সামনের ময়দানে রাজ্যের যত ছেলেপিলেরা শুকনো কলাপাতার তৈরি গোল গোল কী সব ঘুড়ির মতো ওড়াচ্ছে।

বাদশাহ হাঁক পেড়ে বললেন, 'ধরো ওদের, হাত কেটে দাও ওদের সকলের। বাদশাহর হুকুমে ছেলেদের সবাইকে গরুবাঁধা করে ধরে আনা হলো।' বাদশাহ চিৎকার করে বললেন, 'তোমরা আমার হুকুম অমান্য করে ঘুড়ি উড়িয়েচ কেন?'

১০০৫

তাদের মধ্যে থেকে একজন চটপটে গোছের জবাব দিল, 'আমরা ঘুড়ি ওড়াইনি। ঘুড়ি তো চারকোণওয়ালা কাগজের তৈরি হয়।'

বাদশাহ বললেন, 'যা ওড়ে তাই ঘুড়ি। ছেলেটি খুব আশ্চর্য হয়ে বললে– তা হলে পাখি, তুলো, ধুলো, হাওয়ার জাহাজ সবই কি ঘুড়ি? পাখিদের উড়তে দিচ্ছেন কেন? ওদেরও বারণ করে দিন।'

বাদশাহ গর্জন করে বললেন, 'চোপরও! ব্যাপারটা গন্ডগোলের ঠেকছে। ঠিক হায়, পণ্ডিত কই!'

পণ্ডিত এসে বললেন, 'বাদশাহ নামদার, বই তো অন্যরকম কথা বলে। যাহা ঘুরঘুর করে ওড়ে তা-ই ঘুড়ি।'

ছেলেটি চোখ বড়ো বড়ো করে বললে, 'ঘুরঘুর করে আবার কিছু ওড়ে নাকি! আপনি কিছুই জানেন না দেখছি! ওড়ে তো পতপত করে আর ফুরফুর করে ঘোরে।'

পণ্ডিত বললেন, 'থামো দিকি, বেশি ফ্যাচোর ফ্যাচোর কোরো কেন বাপু। তা বাদশাহ নামদার একটু সময় লাগবে, বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে কিনা।'

বাদশাহ বললেন, 'বেশি সময় দিতে পারব না। এক্ষুনি নতিপত্তোর হাতড়ে দ্যাকো। এট্টা বিহিত কত্তেই হবে।'

পণ্ডিত বললেন, 'এ কি আর গোলায় ধান জমানো বাদশাহ নামদার, এ হলো গিয়ে আপনার দশমুনে অভিধান ঘাঁটাঘাঁটির ব্যাপার, সময় দিতেই হবে।'

বাদশাহ একটা আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'দিলাম। এক ঘন্টা।'

চটপটে ছেলেটি পণ্ডিতকে বললে, 'চলুন আমরাও আপনাকে সাহায্য করব।'

পণ্ডিত বকবক করতে করতে ওদের সবাইকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেলেন। ঘরের ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বের করে নিয়ে এলেন দশমুনে এক বান্ডিল। তারপর বিড়বিড় করে আঙুল গুনে বললেন, 'ক খ গ ঘ-ঙ-য়ে ঘুড়ি। সব্বোনাশ করেছে! এ যে ব্যানজোন্ বন্নের চার নম্বোর। গোটা তাড়াতাড়ি খুলতে হবে। ঘুড়ি শব্দো পাওয়া যাবে এক্কেবারে সেই গোড়ার দিকে।'

ছেলেরা সবাই বললে, 'আপনি বুড়ো মানুষ, টানা-হ্যাঁচড়া আপনার শরীরে কুলোবে না। আপনি সামনের দিকটা ধরে থাকুন আমরা সবাই মিলে বান্ডিলটা পিছনের দিকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তা হলেই চট করে খোলা হয়ে যাবে।'

ছেলেরা সবাই একযোগে বান্ডিলটা ঠেলতে ঠেলতে গড়িয়ে পিছনের দিকে নিয়ে চলল। পণ্ডিত ধরে বসে রইলেন সামনের দিকটা।

তারপর হলো কি, বান্ডিলটা ঠেলতে ঠেলতে ছেলেরা একসময়ে হাঁপিয়ে পড়ল, কেননা সেটা ছিল বিরাট। ওজনেও দশ মণের সমান। তাই না পেরে একসময় সবাই ছেড়ে দিল। এক পলকে সড়সড় করে সেটা আগের মতো আবার জড়িয়ে গিয়ে এক ধাক্কায় পণ্ডিতকে ছুড়ে দিলে সামনের সমুদ্রে।

ছেলেরা সবাই তক্ষুনি বাদশাহর কাছে ছুটে গিয়ে নালিশ জানাল। বললে, 'বাদশাহ নামদার, দেখুন পণ্ডিতের কী কাণ্ড! আমাদের বললে তোদের নিয়েই যত অনর্থ, তোরাই অভিধান ঘেঁটে বের কর ঘুড়ি মানে কী, আমি ততক্ষণে একটু সাঁতরে আসি। তারপর তিনি সেই যে সাঁতরাতে গিয়েছেন এখন পর্যন্ত ফেরার নামটি নেই।'

বাদশাহ বললেন, 'যত সব বায়নাক্কা। আক্কেল আলী দ্যাকো দিকি কী ব্যাপার!'

উজির সাগর পাড়ে গিয়ে দেখেন পণ্ডিত রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'এই বুঝি আপনার অভিধান ঘাঁটা?'
পণ্ডিত হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে পাড়ে উঠে এসে বললেন, 'বুঝলেন কিনা, বিদ্যা হলো সমুদ্দুর, তাই একটু ঘেঁটে দেখছিলাম আর কি।'
উজির বললেন, 'তা পেলেন কিছু?'
পণ্ডিত বললেন, 'পেলাম আর কই। বুড়ো মানুষ, আপনাদের মতো দেহও নেই, ক্ষমতায়ও কুলালো না। ঘুড়ি শব্দোটা একেবারে তলদেশে কি-না, ওটা খুঁজে আনা যার-তার কম্মো নয়।'

উজির কী যেন ভাবলেন। তার মনে হলো বাদশার জন্যে তিনি কী না করতে পারেন। বিদ্যাসমুদ্দুরের তলদেশ থেকে ঘুড়ি শব্দের অর্থ খুঁজে আনা তো সহজ কাজ। বরং বাহাদুরি দেখানোর এই এক সুযোগ। বাদশাহ নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।
তিনি বললেন, 'কোথায় দেখিয়ে দিন।'
পণ্ডিত বললেন, 'মাঝিদের বলুন, ওরা মাঝখানে গিয়ে ঠিক জায়গামতোই ঝুপ করে নামিয়ে দেবে।'
উজির বললেন, 'ঠিক হ্যায়!'
জেলেনৌকার মাঝিরা তাদের ডিঙিতে করে সমুদ্দুরের একেবারে মাঝখানে গিয়ে চ্যাংদোলা করে উজির আক্কেল আলীকে ঝুপ করে ছেড়ে দিল। উজির আক্কেল আলী সেই যে সমুদ্দুরের তলদেশে ঘুড়ির অর্থ আনতে গেলেন আর ফিরলেন না।
ছেলেরা দল বেঁধে শাহিমহলের ময়দানে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে সুর ধরল—

উজির গেলেন রসাতলে
বাদশা গেলেন ঘরে
নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে
মাথা ঠুকে মরে।
ঢ্যাম কুড়কুড়, ঢ্যাম কুড়কুড়
তা ধিন ধিনতা ধিন
পদ্য লেখার জোরেই কেবল
এল সুখের দিন।

লেখক-পরিচিতি

মাহমুদুল হকের জন্ম ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন 'ব্রেড হার্নেড' নামে একটি রহস্য-উপন্যাস লিখে সাহিত্যে প্রবেশ করেন। পরবর্তীকালে ছোটোগল্প ও উপন্যাসে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর লেখালেখির বিষয় দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ। 'অনুর পাঠশালা', 'জীবন আমার বোন', 'কালো বরফ' প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। 'চিক্কুর কাবুক' তাঁর কিশোর-রচনা। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য মাহমুদুল হক বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

শমশের আলীজান নামে এক বাদশাহ ছিলেন। দেশের আরও লোকের সঙ্গে নাম মিলে যাওয়ায় নিজের নামটিকে তিন গুণ করে দিলেন তিনি। এতে বেজায় খুশি তার মোসাহেব উজির আক্কেল আলী। এরই মধ্যে বাদশাহ ও উজিরকে নিয়ে কারা যেন বিদ্রূপময় ভাষায় পদ্য লেখা শুরু করে। এতে বেশ ক্ষুব্ধ হন বাদশাহ ও উজির। এরপর দেখা গেল, ঘুড়িতেও কারা যেন পদ্য লিখে রেখেছে। রাজা ঘুড়ি তৈরি ও ওড়ানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ছেলেরা তখন কলাপাতা গোল গোল করে কেটে বাতাসে ওড়ানো শুরু করল। তাতেও বাদশাহ আপত্তি করায় চটপটে এক ছেলে প্রতিবাদ করে বলল, এটা তো ঘুড়ি নয়– কলাপাতা মাত্র। বাদশাহ বললেন, যা ওড়ে তা-ই ঘুড়ি। এবার ছেলেটি পালটা প্রশ্ন করে, তাহলে পাখি, ধুলো, উড়োজাহাজ– এসবও ঘুড়ি, কিন্তু সেসব উড়তে নিষেধ করছেন না কেন? বাদশাহ পড়ে গেলেন মুশকিলে। তাই 'ঘুড়ি' বলতে আসলে কী বুঝায়, তা অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হলো পণ্ডিতকে। ছেলেদের কৌশলে পণ্ডিত পড়ল গিয়ে সমুদ্রে। আর বাদশাহকে খুশি করার জন্য সকল কাজের কাজি আক্কেল আলীও ঘুড়ির অর্থ খুঁজতে 'বিদ্যাসমুদ্দুরে' ঝাঁপ দিল– সেই যে ডুবল আর ভাসল না। ছেলেরা আবার আকাশে ঘুড়ি ওড়াবার সুযোগ পেল। সেটা সম্ভব হলো পদ্য লেখার জোরেই।

হাস্যরসের মাধ্যমে এই গল্পে দুষ্টলোকের স্বাভাবিক পতন এবং সাধারণ মানুষের অধিকার ও জয় তুলে ধরা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

সান্ত্রি	– প্রহরী, রক্ষী। যে পাহারা দেয়।
উজির	– মন্ত্রী।
নাজির	– আদালতের কর্মচারী।
পাত্র-মিত্র	– রাজসভার উজির বা মন্ত্রী।
সভাসদ	– রাজ-দরবারের লোক। সভায় যোগদানকারী ব্যক্তি।
দরবার	– সভা।
প্রাসাদ	– রাজভবন।
প্রাচীর	– দেয়াল।
হিজিবিজি	– আঁকাবাঁকা রেখাযুক্ত অস্পষ্ট লেখা।
চাঁদি	– মাথার উপরিভাগ।

গাঁট্টা — মুঠি করা আঙুলের জোরালো আঘাত।
শূল — ধারালো সরু মুখযুক্ত কাঠ বা লোহা বিশেষ।
আর্জি — নিবেদন।
এন্তার — যাবতীয়, সকল।
গাম্ভীর্য — গম্ভীর ভাব। চাঞ্চল্য না-দেখানো।
পেল্লায় — বড়ো আকারের কোনো কিছু।
ফ্যাচোর ফ্যাচোর — বিরক্তিকর অদরকারি বাক্যপ্রয়োগ।
দশমুনে — দশমণ-বিশিষ্ট।
বান্ডিল — আঁটি। ইংরেজি Bundle।
টানা হ্যাঁচড়া — টানাটানি করা।
অভিধান — এক ধরনের বই। অর্থসহ শব্দকোষ।
বিদ্যাসমুদ্দুর — জ্ঞানের সাগর।
বাহাদুরি — কৃতিত্ব বা সাফল্যে গৌরব করা।

২০২৫

কোকিল

হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্দেরসেন

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

শোনো তবে–

চীনদেশের রাজা একজন চীনেম্যান, তাঁর আগে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে যত লোক, তারাও সব চীনে। রাজার ছিল এক প্রাসাদ, অমন আর পৃথিবীতে হয় না। বাগানে ফোটে কত আশ্চর্য ফুল; সবচেয়ে যেগুলো দামি তাদের গলায় রুপোর ঘণ্টা বাঁধা, কাছ দিয়ে যদি হেঁটে যাও, ঘণ্টার শব্দে ফিরে তাকাতেই হবে। বুঝলে, রাজার বাগানে সব ব্যবস্থাই চমৎকার। এত বড়ো বাগান, মালি নিজেই জানে না তার শেষ কোথায়। যদি কেবলই হেঁটে চলো, আসবে এক বনের ধারে। কী সুন্দর বন, তাতে মস্ত উঁচু গাছ আর গভীর হ্রদ। বন সোজা সমুদ্রে চলে গেছে, নীল জলের অতল সমুদ্র আর ঝুঁকে-পড়া ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক কোকিল। কী মধুর তার গান, এত মধুর যে জেলে মাছ ধরতে এসে হাতের কাজ ফেলে চুপ করে শোনে, যখন শেষ রাতে জাল ফেলতে আসে সে শোনে কোকিলের স্বর।

নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে সেই রাজধানীতে, দেখে বাহবা দেয়। রাজার প্রাসাদ আর বাগান দেখে তাদের চোখের পলক আর পড়ে না; কিন্তু কোকিলের গান যেই তারা শোনে, অমনি বলে ওঠে, 'আহা, এমন আর হয় না!' দেশে ফিরে এসে তারা কোকিলের গল্প করে; পণ্ডিতেরা বড়ো-বড়ো পুথি লেখেন চীন রাজার প্রাসাদ নিয়ে, বাগান নিয়ে; কিন্তু কোকিলকে কি তাঁরা ভুলতে পারেন? সেই পাখির প্রশংসা হাজার পাতা জুড়ে, আর কবিরা হ্রদ-ঘেরা বনের বুকের সেই আশ্চর্য পাখিকে নিয়ে আশ্চর্য সব কবিতা লেখেন।

পুথিগুলো পৃথিবীতে কে না পড়ল! আর চীন রাজার হাতেও কয়েকখানা এসে পড়ল বইকি। তাঁর সোনার সিংহাসনে বসে-বসে তিনি পড়লেন, আরও পড়লেন, পড়তে পড়তে কেবলি খুশি হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন– কেবল তাঁর রাজধানীর, তাঁর প্রাসাদের, তাঁর বাগানের এতসব উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়ে বড়ো ভালো লাগল তাঁর। 'কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোকিল পাখি', সেখানে স্পষ্ট করে লেখা।

রাজা চমকে উঠলেন। কোকিল! সে কী জিনিস? ও-রকম কোনো পাখি আছে নাকি আমার রাজত্বে? আমার বাগানেও নাকি আছে! আমি তো কখনো শুনিনি! কী কাণ্ড, তার কথা আমি প্রথম জানলাম এসব বই পড়ে। রাজা তাঁর প্রধান অমাত্যকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এতই প্রধান যে তাঁর নিম্নস্থ কেউ যদি কখনো সাহস করে তাঁর সঙ্গে কথা বলত তিনি শুধু জবাব দিতেন : 'পি!' আর তার অবশ্য কোনো মানে হয় না।

'কোকিল বলে এক আশ্চর্য পাখি নাকি এখানে আছে', রাজা বললেন। 'এঁরা বলছেন আমার এত বড়ো রাজত্বে সেটাই শ্রেষ্ঠ জিনিস। কই, আমি তো তার কথা কখনো শুনিনি!'

প্রধান অমাত্য একটু ভেবে বললেন, 'রাজসভায় সে তো কখনো উপস্থিত হয়নি, তার তো নামই শুনিনি, মহারাজ।'

রাজা বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় সে আমার সভায় এসে গান করবে, এই আমার আদেশ। যদি সে না-আসে তাহলে আজ সান্ধ্যভোজের পর আমার সমস্ত সভাসদ হাতির নিচে পড়ে মরবে।'

'চুং-পি!' প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন। তারপর আবার তিনি ওঠানামা করলেন দু-শো সিঁড়ি দিয়ে, খুঁজলেন সব ঘর, সব বারান্দা, আর সভাসদরা ছুটল তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে। হাতির নিচে পড়ে মরতে কারুরই পছন্দ নয়।

শেষটায় রান্নাঘরে ছোটো একটা মেয়ের সঙ্গে তাদের দেখা, রাজার পাঁচশো রাঁধুনির জন্য পাঁচশো ঝি, সেই ঝিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সে। সে বলল, 'কোকিল? আমি তো রোজই শুনি তার গান– আহা, সত্যি বড়ো ভালো গায়।'

প্রধান অমাত্য গম্ভীরমুখে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় কোকিলের রাজসভায় আসবার কথা। তুমি পারবে আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে? যদি পারো, এক্ষুনি তোমাকে রাঁধুনি করে দেব, তা ছাড়া মহারাজ যখন ভোজে বসবেন তুমি দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দেখবার অনুমতি পাবে।'

তখন তারা সবাই মিলে গেল সেই বনে, কোকিল যেখানে গান গায়; গেল মন্ত্রী, সেনাপতি, উজির, নাজির, হাকিম, পেশকার।

'ওই তো!' মেয়েটি বলল। 'শুনুন আপনারা, শুনুন– ওই তো সে বসে আছে।' মেয়েটি একটা গাছের ঘন ডালের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

অনেকক্ষণ উঁকিঝুঁকি লাফঝাঁপ মেরে অনেক চেষ্টায় সবাই সেই কালো পাখিকে দেখতে পেল। প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন, 'আরে এ আবার একটা পাখি নাকি। মরি মরি, কী রূপ!'

সমস্ত দল এই রসিকতায় হেসে উঠল।

মেয়েটি গলা চড়িয়ে বলল, 'কোকিল, শুনছ? আমাদের সম্রাট তোমার গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' কোকিল তক্ষুনি মহা উৎসাহে গান গাইতে আরম্ভ করল।

কোকিল ভেবেছিল সম্রাট বুঝি সেখানে উপস্থিত। প্রধান অমাত্য গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বেশ গান তোমার, কোকিল। আজ রাজপ্রাসাদের সান্ধ্যউৎসবে তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করছি, সেখানে তুমি গান শুনিয়ে আমাদের সম্রাটকে মুগ্ধ করবে।'

রাজসভায় আজ উৎসব-সজ্জা।

সভার ঠিক মাঝখানে সোনার একটা ডালে হীরের পাতা বসানো, কোকিল সেখানে বসবে।

সভাসদরা বসেছেন সাজের আর অলংকারের ঝিলিক তুলে, আর সেই ছোটো মেয়েটি দরজার আড়ালে— সে এখন রাজ-রাঁধুনির পদ পেয়েছে। সবাই কোকিলের দিকে তাকিয়ে; স্বয়ং সম্রাট চোখের ইশারায় তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন।

আর কোকিল এমন আশ্চর্য গান করল যে সম্রাটের দুই চোখ জলে ভরে উঠল, চোখ ছাপিয়ে বেয়ে পড়ল গাল দিয়ে; তখন কোকিল গাইল আরও মধুর, আরও তীব্র মধুর স্বরে, তা সোজা বুকের মধ্যে এসে লাগল। সম্রাট এত খুশি হলেন যে তিনি তাকে তাঁর একপাটি সোনার চটি গলায় পরবার জন্যে দিতে চাইলেন। কিন্তু কোকিল বলল, 'মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আর কিছু নিতে পারব না, যথেষ্ট পুরস্কার আমি পেয়েছি। আমি সম্রাটের চোখে অশ্রু দেখেছি— সেই তো আমার পরম ঐশ্বর্য। সম্রাটের অশ্রুর অদ্ভুত ক্ষমতা— এত বড়ো পুরস্কার আর কী আছে।'

তখন থেকে রাজসভাতেই তার বাসা হলো, নিজের সোনার খাঁচায়। দিনের মধ্যে দু-বার সে বেরোতে পারে, আর রাত্রে একবার। আর তার বেরোবার সময় সঙ্গে থাকে বারোজন চাকর, তাদের প্রত্যেকের হাতে পাখির পায়ের সঙ্গে বাঁধা রেশমি সুতো শক্ত করে ধরা। এ রকম বেড়ানোয় কোনো সুখ নেই, সত্যি বলতে।

একদিন রাজার নামে এল মস্ত একটা পার্সেল, তার গায়ে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা, 'কোকিল।'

'এই বিখ্যাত পাখি সম্বন্ধে নতুন একটা বই এল', রাজা বললেন।

কিন্তু বই তো নয়, বাক্সের মধ্যে ছোটো একটা জিনিস। চমৎকার কাজ করা একটা কলের কোকিল, মণি মুক্তো হীরে জহরতে ঝলোমলো, সত্যিকারের পাখির মতো তার গান। কলের পাখিটায় দম দিয়েছ কি সে অবিকল কোকিলের মতো গাইতে শুরু করবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দুলবে তার সোনা-রুপোর কাজ-করা লেজ। গলায় তার ছোট্ট ফিতে বাঁধা, তাতে লেখা : 'জাপানের মহামহিমান্বিত সম্রাটের কোকিলের তুলনায় চীন সম্রাটের কোকিল কিছুই নয়।'

'এখন এরা দুজন একসঙ্গে গান করুক', রাজা বললেন। 'সে কী চমৎকারই হবে!'

দু-জনে একসঙ্গে গাইল, কিন্তু বেশি জমল না। কারণ কলের কোকিল গাইল বাঁধা গৎ, আর সত্যিকারের কোকিল গাইল নিজের খেয়ালে।

কোকিলবাহক বলল, 'আমাদের কোকিলের কিছু দোষ নয়: ও বাঁধা সুরে গায়— একেবারে নিখুঁত।'

তারপর কলের কোকিল একা গাইল। আসল কোকিলেরই মতো সে মুগ্ধ করল— তার ওপর সে দেখতে অনেক ভালো, বাজুবন্ধহারের মতো ঝলমল করছে।

একবার নয়, দুবার নয়, বত্রিশবার কলের কোকিল সেই একই গৎ গাইল, তবু ক্লান্ত হলো না। অমাত্যদের আবার শুনতেও আপত্তি নেই, কিন্তু সম্রাট বললেন, 'এখন জ্যান্ত কোকিল কিছু গান করুক।'

কিন্তু কোথায় সে?

কখন সে উড়ে গেছে খোলা জানালা দিয়ে, ফিরে গেছে বনের সবুজ বুকে, কেউ লক্ষ করেনি।

তারপর অবশ্য কলের কোকিলকে আবার গাইতে হলো, চৌত্রিশবারের বার একই গৎ তারা শুনল। পরের পূর্ণিমায় রাজ্যের সব প্রজাকে নিমন্ত্রণ করা হলো এই পাখি দেখতে— সংগীতবিশারদ দেখাবেন। গানও শুনতে হবে তাদের, রাজার হুকুম। গান তারা শুনল— একবার নয়, দু-বার নয়, ছত্রিশবার। এত খুশি হলো তারা গান শুনে, যেন ছত্রিশ পেয়ালা চা খেয়েছে। কেউ বলল আহা, কেউ বলল ওহো: কেউ ঘাড় নাড়ল, কেউ নাড়ল মাথা; কিন্তু সেই যে জেলে, বনের মধ্যে আসল কোকিলের গান যে শুনেছিল, সে বলল, 'মন্দ নয়, কিন্তু যতবার গাইল এক রকমই লাগল যেন। আর কী-যেন একটা নেই মনে হলো।'

কথাটা সংগীতবিশারদ শুনে ফেললেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী নেই বলো তো বাপু? তালে লয়ে সুরে মানে একেবারে নিখুঁত!'

জেলে বেচারা ঘাবড়ে চুপ করে গেল। আসল কোকিল নির্বাসিত হলো দেশ থেকে। নকল পাখিটা রইল রাজার হালে: সম্রাটের বিছানার পাশে রেশমি বালিশে সে ঘুমোয়, চারদিকে মণিমুক্তো হীরে-জহরতের সব উপঢৌকন ছড়ানো।

সংগীতবিশারদ এই নকল পাখি সম্বন্ধে পঁচিশখানা মোটা-মোটা পুথি লিখে ফেললেন— তাঁর লেখা যেমন লম্বা তেমনি গুরু-গম্ভীর, চীনে ভাষার যত শক্ত-শক্ত কথা সব আছে তাতে— তবু সবাই বলল যে তারা সবটা পড়েছে এবং পড়ে বুঝেছে, পাছে কেউ বোকা ভাবে, কি সংগীতবিশারদ চটে গিয়ে পাগলা হাতির নিচে তাদের থেঁতলে মারেন।

কাটল এক বছর এমনি করে। কলের পাখির গানের প্রতিটি ছোটো-ছোটো টান সম্রাটের মুখস্থ, তাঁর পারিষদদের মুখস্থ, প্রত্যেক চীনের মুখস্থ।

এরই মধ্যে একদিন হলো কী— কলের পাখি গেয়ে চলছে, এত ভালো সে আর কখনোই যেন গায়নি— সম্রাট শুনছেন বিছানায় শুয়ে। হঠাৎ পাখিটার ভেতরে একটা শব্দ হলো, 'গর্‌র্‌র্‌, কী যে একটা ছিঁড়ে গেল 'গাঁ-গাঁ— গর্‌র্‌র্‌র্' সবগুলো চাকা একবার ঘুরে এল, তারপর গান গেল থেমে।

সম্রাট লাফিয়ে উঠলেন, ডেকে পাঠালেন তাঁর দেহ-পুরোহিতকে (চীন সম্রাটের চিকিৎসকের তা-ই উপাধি); কিন্তু তিনি কী করবেন? তারপর ডাকা হলো ঘড়িওয়ালাকে— অনেক বলাবলি, অনেক খোঁজাখুঁজি, টুকটাক ঠুকঠাকের পর পাখিটাকে কোনোরকম মেরামত করা গেল বটে; কিন্তু আগের জিনিস আর হলো না। ঘড়িওয়ালা বলে গেল একে যেন খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা হয়, কলকবজা গেছে খারাপ হয়ে, নতুন আর বসানো যাবে না। এরপর থেকে বছরে একবারের বেশি একে গাওয়ানো যাবে না, আর তাও না-গাওয়ালেই ভালো। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

পাঁচ বছর কেটে গেল— এবার রাজ্যে সত্যিকারের হাহাকার। চীনেরা তাদের সম্রাটকে সত্যি ভালোবাসে, আর এখন শোনা যাচ্ছে সম্রাটের নাকি অসুখ, আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। এরই মধ্যে নতুন একজন সম্রাট ঠিক করা হয়ে গেছে; আর প্রজারা রাজপ্রাসাদের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রধান অমাত্যর কাছে খোঁজ নিচ্ছে রাজা কেমন আছেন।

প্রধান অমাত্য বলছে, 'পি!' আর মাথা নাড়ছেন।

মস্ত জমকালো বিছানায় সম্রাট শুয়ে আছেন— শরীর তাঁর ঠান্ডা, মুখ তাঁর ম্লান। সভাসদদের ধারণা তিনি মরে গেছেন— তাঁরা ছুটেছেন নতুন সম্রাটকে অভিনন্দন জানাতে।

কিন্তু সম্রাট মরেননি; শক্ত, নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছেন জমকালো বিছানায়। ঘরের জানালা খোলা, আকাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সম্রাটের ওপর আর তাঁর কলের পাখির ওপর।

অতি কষ্টে সম্রাটের নিশ্বাস পড়ছে, কেউ যেন চেপে বসেছে তাঁর বুকের ওপর। চোখ মেলে তিনি তাকালেন; দেখলেন তাঁর বুকের ওপর মৃত্যু বসে, তার মাথায় তাঁরই সোনার মুকুট, এক হাতে তাঁরই তরোয়াল, অন্য হাতে তাঁরই ঝকঝকে নিশান। এখন মৃত্যু কিনা তাঁর বুকের ওপর বসে!

'গান! গান!' সম্রাট বলে উঠলেন।

কিন্তু পাখিটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল— কে দেবে তাকে দম, আর দম না-দিয়ে দিলে সে গাইবেই-বা কী করে? আর হঠাৎ জানালার দিক থেকে বেজে উঠল গান, আশ্চর্য মধুর গান। এ সেই ছোট্ট কোকিল, আসল কোকিল, জানালার বাইরে গাছের ডালে বসে সে গাইছে। সে শুনেছিল সম্রাট ভালো নেই, আর তাই সে এসেছে তাঁকে শান্তি দিতে, আশা দিতে। গেয়ে চলল সে একমনে, রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে জোরে বইল সম্রাটের দুর্বল শরীরে; এমনকি মৃত্যুও কান পেতে শুনল, তারপর বলল :

'আহা— থেমো না, বাছা, থেমো না!'

'তবে আমাকে দাও ওই ঝকঝকে সোনালি তরোয়াল, দাও ওই চোখ-ঝলসানো নিশান, দাও ওই সম্রাটের মুকুট।'

আর মৃত্যু একে-একে সব ঐশ্বর্যই দিয়ে দিল, গান শুনবে বলে। কোকিলের গান আর থামে না।

রাজা বলে উঠলেন, 'ধন্য কোকিল, তুমি ধন্য! ওরে দেবতার দূত স্বর্গের পাখি, তোকে তো আমি চিনি! তোকেই না আমি আমার রাজত্ব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম! তবু তুই-ই তো আজ তাড়িয়ে দিলি মৃত্যুকে আমার হৃদয় থেকে! কী পুরস্কার চাস তুই বল।'

কোকিল বলল, 'আমি, তো পেয়েছি আমার পুরস্কার। মহারাজ, প্রথম যেদিন আমি আপনার সামনে গান করি, আপনার চোখে জল এসেছিল। তা আমি কখনো ভুলব না। যে গান গায়, ওর বেশি আর কোন মণিমুক্তো চায় সে? এখন আপনি ঘুমোন, মহারাজ, সুস্থ সবল হয়ে উঠুন, আর আমি আপনাকে গান শোনাই।'

গাইল কোকিল, শুনতে শুনতে সম্রাট ঘুমিয়ে পড়লেন। সে-ঘুম মুছিয়ে দিল তাঁর সকল রোগ, সকল ক্লান্তি। সকালবেলার আলো জানালা দিয়ে তাঁর মুখের ওপর এসে পড়ল; তিনি জেগে উঠলেন— নতুন স্বাস্থ্য, নতুন উৎসাহ নিয়ে। অমাত্য কি ভৃত্য কেউ তখনও আসেনি, সবাই জানে তিনি আর বেঁচে নেই। কেবল কোকিল তখনও গান করছে তাঁর পাশে বসে।

'তুমি সবসময় থাকবে আমার সঙ্গে— থাকবে তো?' সম্রাট বললেন। 'তোমার যেমন খুশি গান করবে তুমি। কলের পুতুলটাকে হাজার টুকরো করে আমি ভেঙে ফেলব।'

কোকিল বলল, 'মহারাজ, মিছিমিছি ওর ওপর রাগ করছেন। যতখানি ওর সাধ্য ও করেছে; এতদিন ওকে রেখেছেন, এখনও রাখুন। আমি তো রাজপ্রাসাদে বাসা বেঁধে থাকতে পারব না; অনুমতি করুন, যখন ইচ্ছে করবে আমি আসব, এসে সন্ধেবেলায় জানালার ধারে ওই ডালের ওপর বসে গান শোনাব আপনাকে— সে গান শুনে অনেক কথা আপনার মনে পড়বে। যারা সুখী তাদের গান গাইব, যারা দুঃখী তাদের গান গাইব; গাইব চারদিকে লুকোনো ভালো-মন্দের গান। আপনার এই ছোটো পাখিটি অনেক দূরে-দূরে ঘুরে বেড়ায়, গরিব জেলের ঘরে, চাষিদের খেতে— আপনার সভার ঐশ্বর্য থেকে অনেক দূরে যারা থাকে, যায় তাদের কাছে, জানে তাদের কথা। আপনাকে আমি গান শোনাব এসে; কিন্তু মহারাজ, একটি কথা আমাকে দিতে হবে।'

'যা চাও! যা কিছু চাও তুমি!' সম্রাট নিজের হাতেই তাঁর রাজবেশ পরে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সোনার তরোয়াল চেপে ধরলেন বুকের ওপর।

'এই মিনতি আমার, ছোটো একটা পাখি এসে আপনাকে সব কথা বলে যায় এ-কথা কাউকে বলবেন না। তাহলেই সব ভালো রকম চলবে।'

এল ভৃত্য, এল অমাত্য মৃত সম্রাটকে দেখতে। এ কী! ওই তো তিনি দাঁড়িয়ে! সম্রাট তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো'।

লেখক-পরিচিতি

হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্দেরসেনের জন্ম ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের আদেনস শহরে। বাবা ছিলেন জুতার কারিগর ও নেহাত গরিব লোক। নানা বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সাহিত্যিক হিসেবে আন্দেরসেন লাভ করেন জগৎজোড়া খ্যাতি। তিনি নাটক, ভ্রমণকাহিনি ও উপন্যাস লিখলেও সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছেন গল্প লিখে। আন্দেরসেনকে বলা হয় গল্পের জাদুকর। কল্পনা ও বাস্তবের মিশেলে রচিত হয়েছে এসব গল্পকথা। এতে মানবিক অনুভূতি গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর রূপকথাগুলো ১২৫টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় আন্দেরসেনের অনেক গল্প অনূদিত হয়েছে। 'মৎস্যকন্যা', 'কুচ্ছিত প্যাঁকারু', 'বুনো হাঁসদের কথা' 'নাইটিঙ্গেল', 'রাজার নতুন পোশাক' প্রভৃতি গল্প ঘরে ঘরে পরিচিত ও জনপ্রিয়। আন্দেরসেন ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে কোপেনহেগেনে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক-পরিচিতি

বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, অনুবাদক ও সম্পাদক ছিলেন। 'প্রগতি' ও 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করে বিশেষ খ্যাতি পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী', ইত্যাদি কাব্য। 'তিথিডোর', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' ইত্যাদি উপন্যাস। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থ। বুদ্ধদেব বসু ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

এটি একটি রূপকথাধর্মী গল্প। চীনদেশে ছিল এক ছোট্ট ও সুকণ্ঠী কোকিল। একদিন রাজদরবারে ডাক পড়ল তার। রাজা কোকিলের গানে মুগ্ধ হয়ে তাকে রেখে দিলেন রাজসভাতেই, সোনার খাঁচায় পুরে। এবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী হলো এক কলের কোকিল। গৎবাঁধা তার কণ্ঠ ও সুর। তবু সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কলের কোকিলের প্রশংসায় অবহেলিত আসল কোকিল একদিন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করল। এরই মধ্যে কলের কোকিলের তার ছিঁড়ে গেল। তাকে মেরামত করা হলো বটে, তবে আগের মতো আর টানা বাজে না। রাজ্যে পড়ে গেল হাহাকার। রাজাও হলেন বেজায় অসুস্থ, পড়ে রইলেন বিছানায় নিথর। কিন্তু রাজা মারা যাননি, তবে মৃত্যুভীতি তাঁর বুকে চেপে বসেছে। আর মুমূর্ষু রাজা কলের কোকিলের উদ্দেশে বলছেন, গান গাও, গান! কিন্তু কলের কোকিল চুপ, কণ্ঠে তার গান নেই। ঠিক সে সময় জানালার বাইরে গান গেয়ে উঠল ছোট্ট সেই কোকিল, অপূর্ব সে সুর। গান তার আর থামে না। রাজ্যের এই দুর্দিনে রাজার প্রাণ রক্ষা করতে সে এসেছে ফিরে। সারারাত মধুর গান গেয়ে রাজাকে ঘুম পাড়াল কোকিল। সকালে রাজা জেগে উঠলেন– পেলেন নতুন জীবন, নতুন উৎসাহ। বিনিময়ে কোকিল কিছুই নিল না কৃতজ্ঞ রাজার কাছ থেকে। শুধু স্বাধীনভাবে রাজা, প্রজা, জেলে, চাষি সকলের জন্য দুঃখ-সুখের গান গাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল আর সবার অগোচরে রাজাকে জানাতে চাইল রাজ্যের সত্যিকার সকল খবর।

আসলে যে সত্যিকার উপকারী, সে কিছু পাওয়ার আশায় উপকার করে না। অন্যদিকে যন্ত্রের চাকচিক্য সবসময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিকল্প হয় না। গল্পটিতে এসব সত্যের প্রকাশ ঘটেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

চীনেম্যান	– চীনদেশীয় লোক।
হ্রদ	– চারদিকে স্থল দিয়ে ঘেরা জলাশয়।
অতল	– যার তল নেই।
রাজধানী	– দেশশাসনের কেন্দ্র, যেখানে প্রধান প্রধান সরকারি অফিস থাকে।
প্রাসাদ	– ইমারত, বাড়ি।
অমাত্য	– আমলা, মন্ত্রী। রাজকর্মে মন্ত্রণাদাতা ব্যক্তি।
নিম্নস্থ	– নিচের।
সান্ধ্যভোজ	– সন্ধ্যাকালের খাবারের আয়োজন।
সভাসদ	– সভায় যোগদানকারী ব্যক্তি। দরবারের লোক। রাজ-আমলা বা মন্ত্রী।

উজির — মন্ত্রী।
নাজির — আদালতের কর্মচারী, যিনি পেয়াদাদের দেখাশোনা করেন।
পেশকার — আদালতের কর্মচারী, যিনি বিচারকের কাছে কাগজপত্র উপস্থাপন করেন।
রাজ-রাঁধুনি — উপাধি বিশেষ। রাজকীয় রান্নার কাজে নিযুক্ত প্রধান পাচক।
পার্সেল — মোড়ক বা প্যাকেট।
স্বয়ং — নিজে, আপনি।
সোনার চটি — সোনার তৈরি পাতলা স্যান্ডেল বিশেষ।
ঐশ্বর্য — সম্পদ।
মহামহিমান্বিত — অতিশয় গৌরবান্বিত।
কোকিলবাহক — কোকিল বহনকারী। যে কোকিলকে বহন করে।
বাজুবন্ধহার — একধরনের অলংকার। বাহুতে পরার অলংকার বিশেষ।
গৎ — গানের নির্ধারিত বা বাঁধা সুর।
সংগীতবিশারদ — সংগীতজ্ঞ। গান-বাজনা বা বাদ্যযন্ত্রের সুর, তাল, লয়, ধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান রাখেন যিনি।
নির্বাসিত — নিজের দেশ থেকে বহিষ্কৃত।
উপঢৌকন — উপহার।
পারিষদ — সদস্য, সভ্য, সভাসদ।
কলকব্জা — যন্ত্রপাতি।
নিস্সাড় — অচেতন।
নিশান — পতাকা।

কিং লিয়ার

উইলিয়াম শেক্‌সপিয়র

রূপান্তর : জাহানারা ইমাম

ব্রিটেনের রাজা লিয়ার বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি স্থির করেছেন, তাঁর রাজ্য তিন ভাগে ভাগ করে তিন মেয়েকে দান করবেন। বড়ো দুই মেয়ে গনেরিল ও রিগানের বিয়ে হয়েছে আলবেনির ডিউক ও কর্নওয়ালের ডিউকের সঙ্গে। ছোটো মেয়ে কর্ডেলিয়া এখনো কুমারী। ফ্রান্সের রাজকুমার এবং বার্গান্ডির ডিউক— এই দুজনই কর্ডেলিয়ার পাণিপ্রার্থী হয়ে ব্রিটেনে এসেছে। রাজা লিয়ার তাঁর রাজদরবারে আজ সবাইকে ডেকেছেন। তিন মেয়ে, দুই জামাই, কর্ডেলিয়ার দুই পাণিপ্রার্থী, গ্লস্টারের আর্ল, কেন্টের আর্ল এবং আরো অনেকে উপস্থিত হয়েছেন রাজা কী বলেন, তা শোনার জন্য।

রাজা সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য-শাসনের ঝক্কি-ঝামেলা আমার ভালো লাগে না। আমার কন্যা-জামাতাদের ওপর এই ভার ছেড়ে দিয়ে আমি শান্তিতে শেষদিনের প্রতীক্ষায় থাকতে চাই। এখন আমি

আমার কন্যাদের মুখ থেকে শুনতে চাই, আমাকে কে কতখানি ভালোবাসে। গনেরিল, তুমি আমার বড়ো মেয়ে, তুমিই প্রথমে বলো।' গনেরিল বলল, 'পিতা, আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা আমি কথায় প্রকাশ করতে অক্ষম। এই পৃথিবীতে যা কিছু মহান, সুন্দর, জীবনের যা কিছু কাম্য, আরাধ্য সবকিছুর চেয়ে, আমার এই দুই চোখের জ্যোতির চেয়ে, আমার সমগ্র জীবনের চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসি।'

বড়ো বোনের কথা শুনে কর্ডেলিয়া মনে মনে বলল, কর্ডেলিয়া তুমি তা হলে কী করবে? তুমি তো অমন করে ভালোবাসার কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে না। ভালোবেসে নীরবেই থেকো তুমি। গনেরিলের কথা শুনে রাজা খুব সন্তোষ প্রকাশ করে তাকে রাজ্যের সেরা এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন। তারপর মেজো মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার তুমি কী বলো?' রিগান বলল, 'আমার বড়ো বোন দেখি আমারই মনের কথাগুলো সব বলে দিয়েছে। তবে একটা কথা সে বলতে পারেনি, তা হলো আপনার ভালোবাসা ছাড়া আমার জীবনের অন্যসব সুখ-আনন্দ তুচ্ছ।' শুনে কর্ডেলিয়া আরেকবার মনে মনে হায় হায় করল, বেচারি কর্ডেলিয়া। তুমি তো ওদের মতো মুখ ফুটে বলতে পারবে না! কিন্তু তাই বলে তোমার ভালোবাসা কারো চেয়ে কম নয়; বরং তা এত গভীর যে জিভের ডগায় আনলে তার মর্যাদাহানি হবে।

রাজা রিগানের প্রশস্তি শুনে পরম হৃষ্টচিত্তে তাকে রাজ্যের অপর এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন। এবার কর্ডেলিয়ার পালা। রাজা লিয়ার তিন মেয়ের মধ্যে কর্ডেলিয়াকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। কর্ডেলিয়া যেন তাঁর চোখের মণি। কিন্তু এখন কর্ডেলিয়া যা বলল, তা শুনে রাজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কর্ডেলিয়া বলল, 'পিতা, আমার মনের কথা মুখে আনতে পারছি না। তার জন্য আমার অশান্তির সীমা নেই। একটি মেয়ের তার পিতাকে যতখানি ভালোবাসা কর্তব্য, ঠিক ততখানিই আপনাকে ভালোবাসি। তার বেশিও নয়, কমও নয়।'
অপমানে রাজা লিয়ারের মুখ কালো হয়ে গেল, তিনি বললেন, 'কথাটা ঘুরিয়ে নাও কর্ডেলিয়া, নইলে তোমারই ক্ষতি।'
কী বলব পিতা! আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, লালন করেছেন, ভালোবেসেছেন। প্রতিদানে আমি আপনাকে ভালোবাসি, মান্য করি, সম্মান করি।
আমার বোনেরা যে বলেছে তাদের সবটুকু ভালোবাসা আপনাকেই দিয়েছে, তা হলে তাদের স্বামীদের জন্য কী রেখেছে? আমার বিয়ে হলে আমার স্বামীকেও তো আমি ভালোবাসব। তখন কি পিতার প্রতি কন্যার ভালোবাসা ও কর্তব্য ভাগ হয়ে যাবে না? সেটাই তো স্বাভাবিক। অতএব বোনদের মতো করে আমি বলতে পারব না।
রাজা লিয়ার অপমানে, ক্রোধে অস্থির হয়ে বললেন, 'তুমি সত্যি সত্যি বলছ?'
'হ্যাঁ, পিতা, সত্যি সত্যি।'

'এত কম তোমার বয়স, এখনই এমন কঠিন তোমার মন?'
'বয়স আমার কম বটে, তবে যা সত্য, তা-ই বলছি।'
ক্রোধে, অপমানে, দুঃখে রাজার মুখ থমথম করতে লাগল, তিনি ভয়ংকর স্বরে বললেন, 'তুমি তাহলে তোমার সত্য নিয়েই থাকো। এই মুহূর্তে আমি তোমাকে ত্যাজ্যকন্যা করলাম। আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও। আমিও তোমার কেউ নই। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও তুমি।'

বিষম ক্রোধে রাজা তাঁর রাজ্যের বাকি অংশ— যেটা কর্ডেলিয়ার জন্য রেখেছিলেন, সেটা বড়ো দুই মেয়েকে ভাগ করে দিলেন। তিনি শুধু রাজা নামটা নিজের জন্য রাখলেন, কিন্তু রাজ্য শাসনের যাবতীয় দায়িত্ব দুই জামাতার ওপর ন্যস্ত করলেন। তিনি বললেন, এখন থেকে তিনি মাত্র এক শত জন যোদ্ধারক্ষী সঙ্গে রাখবেন। এবং পালাক্রমে এক মাস করে গনেরিল ও রিগানের কাছে বাস করবেন।

যে বিষয়টা আনন্দোৎসবের ভিতর দিয়ে শুরু হয়েছিল, তার এরকম ভয়াবহ পরিণতি দেখে রাজা লিয়ারের সভাসদবর্গ সকলে বিস্মিত, হতচকিত হয়ে গেলেন। কর্ডেলিয়ার জন্য দুঃখে তাঁরা মুহ্যমান হলেও ভয়ে কেউ রাজার সামনে কোনো প্রতিবাদ করতে পারলেন না। ভয় পেল না শুধু আর্ল অব কেন্ট। রাজার সভাসদবর্গের মধ্যে কেন্টই সবচেয়ে বিশ্বস্ত। লিয়ারের প্রতি তার অগাধ ভক্তি। লিয়ার তার কাছে পিতৃতুল্য। সে নির্ভীক কণ্ঠে, কর্ডেলিয়ার প্রতি রাজার এই অবিচারের প্রতিবাদ করল, 'এ আপনি কী করছেন রাজা? কর্ডেলিয়া যে আপনাকে কম ভালোবাসে না, সেটা কি বুঝতে পারছেন না? অন্তঃসারশূন্য তোষামোদবাক্যই আপনার কাছে বেশি মূল্য পেল?'

রাজা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'যদি বাঁচতে চাও, তাহলে চুপ থাকো।'

'আমার এ জীবন আপনার সেবাতেই উৎসর্গ করা। আপনি তা নিলে নিয়ে নেবেন। আমার ভয় কীসের?'

রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে তখনই কেন্টকে নির্বাসন-দণ্ড দিলেন। ছয় দিনের মধ্যে তাকে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। কর্ডেলিয়া এখন কপর্দকশূন্য, নিরাশ্রয়। এই অবস্থায় বার্গান্ডির ডিউক তাকে বিবাহ করতে চাইল না। কারণ, রাজত্ব ছাড়া রাজকন্যার কোনো মূল্য নেই তার কাছে। ফ্রান্সের যুবরাজ কিন্তু রাজার স্নেহ এবং তার রাজত্ব থেকে বঞ্চিত কর্ডেলিয়াকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবে বলে জানাল। কারণ, সে বুঝে গেছে, কর্ডেলিয়া রমণীকুলে রত্নস্বরূপ। সে স্বার্থসাধনের জন্য তোষামোদের বাক্য সাজিয়ে কাউকে খুশি করতে পারে না, কিন্তু তার অন্তরে প্রজ্বলিত প্রেম, প্রীতি, কর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সে সচেতন, সৎ। এ রকম রমণীকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের কথা। সে কর্ডেলিয়াকে বলল, 'আমি তোমার মতো গুণবতী-রূপবতী রমণীকে পেয়ে ধন্য। তুমি একই সঙ্গে আমার মনের রানি এবং আমার দেশেরও রানি হয়ে নিশ্চয় সুখী হবে। যদিও তোমার পিতা তোমার প্রতি এই রকম নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবহার করেছেন, তবুও তুমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে এসো।'

কর্ডেলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রথমে পিতা ও পরে ভগ্নিদ্বয়ের কাছে বিদায় নিয়ে ফ্রান্সের যুবরাজের সঙ্গে চলে গেল।

গনেরিলের কাছে কয়েক সপ্তাহ থাকার পরই রাজা লিয়ার টের পেতে লাগলেন মেয়ের কথা ও কাজের মধ্যে কী আকাশ-পাতাল প্রভেদ। গনেরিল পিতার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না, পিতার অনুচর যোদ্ধারক্ষীদের কার্যকলাপের খুঁত ধরে, গনেরিলের কাজের লোকেরা রাজাকে যথাযোগ্য সম্মান করে না। এতে প্রতিপদেই লিয়ারের মেজাজ খারাপ হতে লাগল। রাজা দিশেহারা হয়ে গেলেন। এ কী কাণ্ড! যে মেয়ে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁকে বলেছে, তার জীবনের চেয়েও বেশি তাঁকে ভালোবাসে, যাকে তিনি তাঁর রাজ্যের অর্ধেক দান করেছেন, রাজমুকুট পর্যন্ত জামাতার মাথায় বসিয়েছেন, সেই আদরের মেয়ের এখন এ কী ব্যবহার, এ কী কটু কথা! রাজাকে যেন সে সহ্যও করতে পারছে না। রাজার একশ জন যোদ্ধা-সহচরকে সে উৎপাত বলে মনে করছে। সে কি-না পিতার মুখের ওপরই বলে দিল, তাঁর এতগুলো রক্ষী-অনুচরের কোনো প্রয়োজনই নেই।

বিষম ক্রোধে লিয়ার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে অনেক তিরস্কার করলেন। তারপর অশ্ব প্রস্তুত করতে বললেন। তিনি আর একমুহূর্ত এই অকৃতজ্ঞ কন্যার প্রাসাদে থাকবেন না। তাঁর আরো একটি মেয়ে আছে। তিনি রিগানের কাছে চলে যাবেন। সেই মর্মে একটি চিঠি লিখে তিনি কাইয়াসকে দিয়ে রিগানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু গনেরিলও কম যায় না। সেও তড়িঘড়ি রিগানকে একটি চিঠি পাঠাল। তাতে লিখল, রাজা লিয়ার বৃদ্ধ বয়সে কী রকম অবিবেচক, বদমেজাজি এবং উপদ্রবস্বরূপ হয়ে উঠেছেন। তাঁর একশ জন যোদ্ধা-সহচরও গনেরিল এবং রিগানের পক্ষে হুমকিস্বরূপ। রিগান যেন লিয়ারকে কোনোভাবেই পাত্তা না দেয় এবং তাঁর রক্ষীসংখ্যা কমাবার জন্য যেন চাপাচাপি করে।

গনেরিল এই চিঠি পাঠিয়েই ক্ষান্ত রইল না, সে নিজেও রিগানের কাছে চলে গেল। রাজা লিয়ার রিগানের প্রাসাদে এসে দেখেন, বোনের হাত ধরে গনেরিল সেখানে উপস্থিত। রিগান স্থির কণ্ঠে পিতাকে জানাল, সে এখন লিয়ার এবং তাঁর একশ রক্ষীকে সমাদর করার জন্য প্রস্তুত নয়। লিয়ারের উচিত রক্ষীসংখ্যা কমিয়ে অর্ধেক করে বড়ো মেয়ের কাছে ফিরে যাওয়া এবং নির্ধারিত সময়টুকু সেখানেই কাটানো। রাজা লিয়ারের পরিচিত জগৎ তাঁর চোখের সামনেই উলটে গেল। এ কী কথা তিনি শুনছেন তাঁর দ্বিতীয় কন্যার মুখে! এই মেয়ে দুটিই কি তাঁকে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে পৃথিবীর সর্বোত্তম ভালোবাসার কথা শুনিয়েছিল? সেই একই মেয়ে দুটিই কি এই রকম নিষ্ঠুর বাক্য কঠিন মুখ করে শোনাচ্ছে? ক্রোধে, দুঃখে, অপমানে রাজা লিয়ার উপলব্ধি করলেন, তাঁর জীবদ্দশাতেই এভাবে রাজ্য বিলিয়ে দিয়ে, ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি কী ভুল করেছেন! সেই সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, কর্ডেলিয়ার প্রতি তিনি কী নিদারুণ অবিচার করেছেন।

রাজার এই রকম দুঃসময়ে তাঁর পাশে যে দুজন বিশ্বস্ত অনুচর রয়েছে, তারা হলো রাজার প্রিয় বিদূষক, যে তাঁকে সব সময় মজার মজার কথা বলে হাসায়, আনন্দ দেয়। লিয়ার তাঁর রাজমুকুট জামাতাকে দিয়ে দিলেও বিদূষকটি রাজার পাশ ছাড়েনি। সে রাজাকে যথার্থই ভালোবাসে। আর রয়েছে কাইয়াস নামে এক নবনিযুক্ত ভৃত্য। কাইয়াস আসলে ছদ্মবেশী আর্ল অব কেন্ট। রাজা লিয়ার যদিও তাকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন, রাজার প্রতি আনুগত্যবশত কেন্ট রাজাকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারেনি। রাজা বৃদ্ধ, রাজা খামখেয়ালি, রাজা মেজাজি, তবু তো তিনি রাজাই। কন্যাদের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার বশে তিনি জীবদ্দশাতে রাজ্য ও রাজমুকুটের দখল ছেড়েছেন, অথচ সেই অকৃতজ্ঞ কন্যারা আজ তাঁকে কী হেনস্তাই না করছে। মেজো মেয়ের কাছ থেকেও এরকম ব্যবহার পেয়ে রাজা প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলেন। সে সময় বাইরে তুমুল ঝড়বৃষ্টি চলছে। রিগান কিছুতেই পিতাকে তার প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেবে না। তাঁকে বড়ো মেয়ের কাছেই ফিরে যেতে হবে। রাজা বৃদ্ধ হলেও আত্মমর্যাদাবোধ এখনও হারাননি। তিনি সেই তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই প্রান্তরে বেরিয়ে গেলেন।

ঝড়বৃষ্টির রাতে রাজা লিয়ার এক চালাঘরে এসে আশ্রয় নিলেন। সেখানে বসবাসকারী এডগারকে দেখে রাজার বিদূষক প্রথমে ভয় পেয়ে যান। এডগার পাগলের অভিনয় করার জন্য কাপড়চোপড় সব খুলে উলঙ্গ হয়ে কোমরে শুধু একটা কম্বল জড়িয়ে থাকার জন্য বিদূষকটি প্রথমে ভেবেছিল, ওটা একটা ভূত বা প্রেত। পরে

এডগারের কথা শুনে আশ্বস্ত হলো— ওটা নেহাতই একটা পাগল। রাজা লিয়ার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমিও কি তোমার মেয়েদের সব দান করে দিয়ে এই রকম নিঃস্ব হয়েছ?' মেয়েদের নিষ্ঠুর ব্যবহারে লিয়ারের মন এমনই ভেঙে গিয়েছে যে তিনি উন্মাদ হওয়ার পর্যায়ে চলে গেছেন।

কেন্ট তাঁকে দেখছে আর ভীত হচ্ছে। কী করে রাজাকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করবে, সেই চিন্তায় সে অস্থির। সে ইতোমধ্যেই যেসব খবর সংগ্রহ করেছে, তা-ও বেশ বিপজ্জনক। গনেরিল ও রিগানের ষড়যন্ত্রের ফলে লিয়ারের জীবনও এখন আর নিরাপদ নয়। যত শীঘ্র সম্ভব রাজাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রাজা যেরকম সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন, তাতে তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গ্লস্টার কেন্টের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি রিগান ও তার স্বামী কর্নওয়ালের নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাজাকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। এ কাজে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হলো। কজন অনুচর মিলে রাজাকে বেশ করে ঠেসে ধরে তবে প্রাসাদে আনতে পারল। প্রাসাদের ভিতরে এসে লিয়ার এক কাল্পনিক রাজদরবার বসিয়ে তাঁর বড়ো দুই মেয়ের বিচার করতে শুরু করলেন। তাঁর এই বদ্ধ-উন্মাদ অবস্থা দেখে বিশুদ্ধ আর্ল অব গ্লস্টারের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি আর্ল অব কেন্টকে বললেন, রাজাকে ডোভারে নিয়ে যেতে। সেখানে অন্তত রাজার প্রাণের ভয় থাকবে না। তারপর সেখান থেকে ফ্রান্সের রানি কর্ডেলিয়াকে সংবাদ প্রেরণ করা মোটেই কঠিন হবে না। কারণ ডোভার ফ্রান্সের কাছাকাছি ব্রিটেনের সীমান্তে অবস্থিত। ডোভারের পরেই ছোটো একটি চ্যানেল পার হয়ে সীমান্ত শুরু হয়।

ওদিকে গনেরিল যখন সংবাদ পেল যে রাজা লিয়ার সীমান্তবর্তী শহর ডোভারে পৌঁছেছেন, তখন সে নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল লিয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে। এই মর্মে সে যখন বোন রিগানের কাছে খবর পাঠাতে যাবে, তখন শুনল ভগ্নিপতি কর্নওয়াল মৃত্যুবরণ করেছে। তখন সে এডমন্ডের সাহায্যে এই যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো। গনেরিলের স্বামী ডিউক অব আলবেনি সবসময়ই রাজা লিয়ারের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং স্ত্রীর এই নিষ্ঠুর আচরণ কখনো সমর্থন করতেন না। তিনি মনে মনে স্থির করলেন রাজা লিয়ারকে সাহায্য করবেন।

ফ্রান্সের রানি কর্ডেলিয়া বেশ সুখ এবং সম্মানের সঙ্গে জীবন-যাপন করছিল। কেবল পিতার কথা মনে হলে তার বুকের ভিতর একটি ব্যথার কাঁটা খচখচ করত। হঠাৎ একদিন সে খবর পেল, তার পিতা খুব কাছে ফ্রান্স-সীমান্তের ওপারেই ডোভারে রয়েছেন। বড়ো দুই বোন কী অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাঁকে বিতাড়িত করেছে, কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় তিনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন— এসব খবরও কর্ডেলিয়ার কানে এল। শুনে তার দুই চোখ দিয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে লাগল। তার স্বামী ফ্রান্সের রাজাকে অনুরোধ করল, রাজা যেন তার সঙ্গে কিছু সৈন্য দেন যাতে সে ডোভারে গিয়ে পিতার সঙ্গে মিলিত হতে পারে এবং দুই বোনের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে তার পিতাকে আবার তাঁর সিংহাসনে বসাতে পারে। ফ্রান্সের রাজা কর্ডেলিয়ার সঙ্গে ডোভার পর্যন্ত এসে আবার জরুরি কাজে ফ্রান্সে ফিরে গেলেন। কর্ডেলিয়া ডোভারের পথে-প্রান্তরে পিতাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। লিয়ার এমনই খামখেয়ালি যে এক জায়গায় তাঁকে স্থিরভাবে রাখা যায় না। তিনি প্রায়ই অনুচরদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ান।

লিয়ার এখনো ঘোর উন্মাদ। কর্ডেলিয়ার লোকজনও রাজাকে সর্বত্র খুঁজছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন মাঠে এসে রাজার দেখা পেল এবং বেশ কায়দা করে রাজাকে নিয়ে গেল কর্ডেলিয়ার শিবিরে। কর্ডেলিয়া চোখের পানি চেপে মমতা ও যত্নের সঙ্গে অসুস্থ পিতার সেবা করতে লাগল। চিকিৎসকের যথাযথ ঔষধ প্রয়োগে এবং কর্ডেলিয়ার সেবাযত্নে লিয়ার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু রাজা লিয়ারের ভাগ্য নিতান্তই খারাপ। তাঁর দুঃখ ও অপমানের দিন এখনো যেন শেষ হয়নি।

গনেরিল ও রিগানের প্রেরিত সম্মিলিত সেনাবাহিনীর কাছে কর্ডেলিয়ার অপ্রতুল সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং রাজা লিয়ার কর্ডেলিয়াসহ বন্দি হলেন। এডমন্ড কৌশলে গুপ্তঘাতককে নির্দেশ দিয়ে কর্ডেলিয়ার প্রাণসংহার করালো। রাজা লিয়ারের শেষ অবলম্বনটুকুও এ ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল। তাঁর বুকফাটা হাহাকারে এই অকরুণ পৃথিবীর নির্মম আকাশও যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

(সংক্ষেপিত)

লেখক-পরিচিতি

ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবশালী কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেকস্‌পিয়র। তাঁর জন্ম ইংল্যান্ডের স্ট্রাটফোর্ড-অব-অ্যাভনে, ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। শেকস্‌পিয়রের জীবন ছিল দুঃখ-দুর্দশায় ভরা। মাত্র বায়ান্ন বছরের জীবনের মধ্যে তাঁর সাহিত্য রচনার কাল ছিল তিরিশ বছরেরও কম। তিনি কমেডি ও ট্র্যাজেডিধর্মী নাটক রচনা করলেও পৃথিবীর সেরা ট্র্যাজেডি-লেখক হিসেবেই সম্মান পান। শেকস্‌পিয়রের সেরা ট্র্যাজেডিগুলো হচ্ছে 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো' ও 'কিং লিয়ার'। উল্লেখযোগ্য কমেডিগুলো হচ্ছে 'কমেডি অব এররস', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'আ মিডসামার নাইটস ড্রিমস' ইত্যাদি। এসব নাটকে তিনি আনন্দ-বেদনার অন্তরালে মানুষের জীবনের গভীর সত্যকে সন্ধান করেছেন। শেকস্‌পিয়র মৃত্যুবরণ করেন ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে।

রূপান্তরকারী লেখক-পরিচিতি

জাহানারা ইমামের জন্ম ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায়। পেশায় তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক, ছিলেন নিবেদিত সংস্কৃতিকর্মী ও সংগঠক। জাহানারা ইমাম একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। সাহিত্যজীবনে শিশুসাহিত্য, অনুবাদ, মুক্তিযুদ্ধ, স্মৃতিকথা প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের রচনায় সৃষ্টিমুখর ছিলেন। 'একাত্তরের দিনগুলি' তাঁর সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাঁর উল্লেখযোগ্য অপর গ্রন্থগুলো হচ্ছে 'ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস', 'শেকস্‌পিয়রের ট্র্যাজেডি', 'নিঃসঙ্গ পাইন'। 'গজকচ্ছপ', 'সাতটি তারার ঝিকিমিকি' ইত্যাদি তাঁর শিশুতোষ রচনা। একাত্তরে জাহানারা ইমামের জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা সফি ইমাম রুমী শহিদ হওয়ার কারণে তিনি 'শহিদ-জননী' হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও স্বাধীনতা পদকও লাভ করেন। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

রচনাটি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'কিং লিয়ার' নাটকের সংক্ষিপ্ত আখ্যান বা গল্পরূপ। ব্রিটেনের রাজা লিয়ার বৃদ্ধকালে স্থির করলেন তাঁর তিন মেয়ে গনেরিল, রিগান আর কর্ডেলিয়াকে রাজ্য ভাগ করে দেবেন। রাজসভা ডেকে সভাসদদের সামনেই তিন মেয়েকে একে একে জিজ্ঞেস করলেন কে তাঁকে কতটুকু ভালোবাসে। বড়ো দুই মেয়ে গনেরিল আর রিগান বলে দিল তারা তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি বাবাকে ভালোবাসে সুতরাং তিনি তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সমানভাগে ভাগ করে দিলেন। ছোটো মেয়ে কর্ডেলিয়াকে রাজা ভালোবাসতেন বেশি, তাই তার কাছে প্রত্যাশাও ছিল বেশি। কিন্তু এই কন্যার কাছে যা শুনলেন তাতে, রাজা গেলেন খেপে। কর্ডেলিয়া বলল, একটি মেয়ের তার বাবাকে যতটা ভালোবাসা কর্তব্য ততটাই সে ভালোবাসে। রাজা লিয়ার কর্ডেলিয়াকে ত্যাজ্য করলেন, তাকে রাজ্য থেকে বের করে দিলেন এবং সম্পূর্ণ রাজ্য বড়ো ও মেজো মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রাজা লিয়ারের এমন অবিচক্ষণ সিদ্ধান্ত তার জীবনের জন্য কাল হলো। সমুদয় রাজ্য দুই মেয়েকে দান করায় তিনি তাদের করুণার পাত্র হয়ে পড়লেন; একসময় দুবোন মিলে রাজাকে রাজবাড়ি থেকে বের করে দিল। রাজার জীবনে নেমে এল দুঃসহ গ্লানি আর দুঃখ। তিনি বুঝতে পারলেন, গনেরিল আর রিগানের ভালোবাসা ছিল মেকি আর কর্ডেলিয়ার ভালোবাসা ছিল সত্যিকারের। কিন্তু তাঁর করার কিছুই ছিল না। একপর্যায়ে তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে যান। লিয়ারের এই দুঃসময়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ায় ত্যাজ্য ছোটো মেয়ে কর্ডেলিয়াই। মানুষ তার নিজের ভুলের জন্য দুঃখ, কষ্ট আর বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। কিং লিয়ার তোষামোদে তুষ্ট হয়ে জীবনে করুণ পরিণতি ডেকে এনেছেন। ভুলে গিয়েছিলেন প্রকৃত ভালোবাসা অনুভূতির ব্যাপার, তা পরিমাপযোগ্য বিষয় নয়।

শব্দার্থ ও টীকা

ডিউক	— ইংল্যান্ডে প্রচলিত একটি সম্মানজনক উপাধি। ইংরেজি Duke.
পাণিপ্রার্থী	— বিয়ে করতে ইচ্ছুক।
আর্ল	— একটি উপাধি। ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল।
জ্যোতি	— আলো, উজ্জ্বল।
সন্তোষ	— আনন্দ, খুশি।
এক-তৃতীয়াংশ	— তিন ভাগের এক ভাগ।
হৃষ্টচিত্তে	— আনন্দচিত্তে, খোশমেজাজে।
স্তম্ভিত	— কোনো কারণে জড়ের মতো হয়ে যাওয়া। নির্বাক।
ক্রোধ	— রাগ।
পালাক্রমে	— একে একে।
আনন্দোৎসব	— আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য যে উৎসব।
অন্তঃসারশূন্য	— যার ভেতরে কিছু নেই।
তোষামোদ	— চাটুকারিতা।
ক্ষিপ্ত	— ক্ষুব্ধ, রাগান্বিত।

কপর্দকশূন্য — টাকা-পয়সা নেই, এমন বোঝানো হয়েছে।
অশ্রুপূর্ণ — জলে ভরা।
প্রভেদ — পার্থক্য।
অনুচর — সঙ্গী, সহচর, ভৃত্য।
যোদ্ধারক্ষী — পাহারাদার সেনা।
উৎপাত — যন্ত্রণা, উপদ্রব।
তড়িঘড়ি — তাড়াতাড়ি।
রক্ষী — পাহারাদার, সেনা।
উপলব্ধি — অনুভব, অনুভূতি, বোধ।
নিদারুণ — কঠিন, নির্দয়।
বিদূষক — ভাঁড়, যে কৌতুক করে। রঙ্গরস-সৃষ্টিকারী অনুচর।
খামখেয়ালি — খেয়ালখুশি, খুশিমতো চলার স্বভাব বিশিষ্ট।

যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্র

আবুল কাসিম ফেরদৌসি

রূপান্তর : মমতাজউদদীন আহমদ

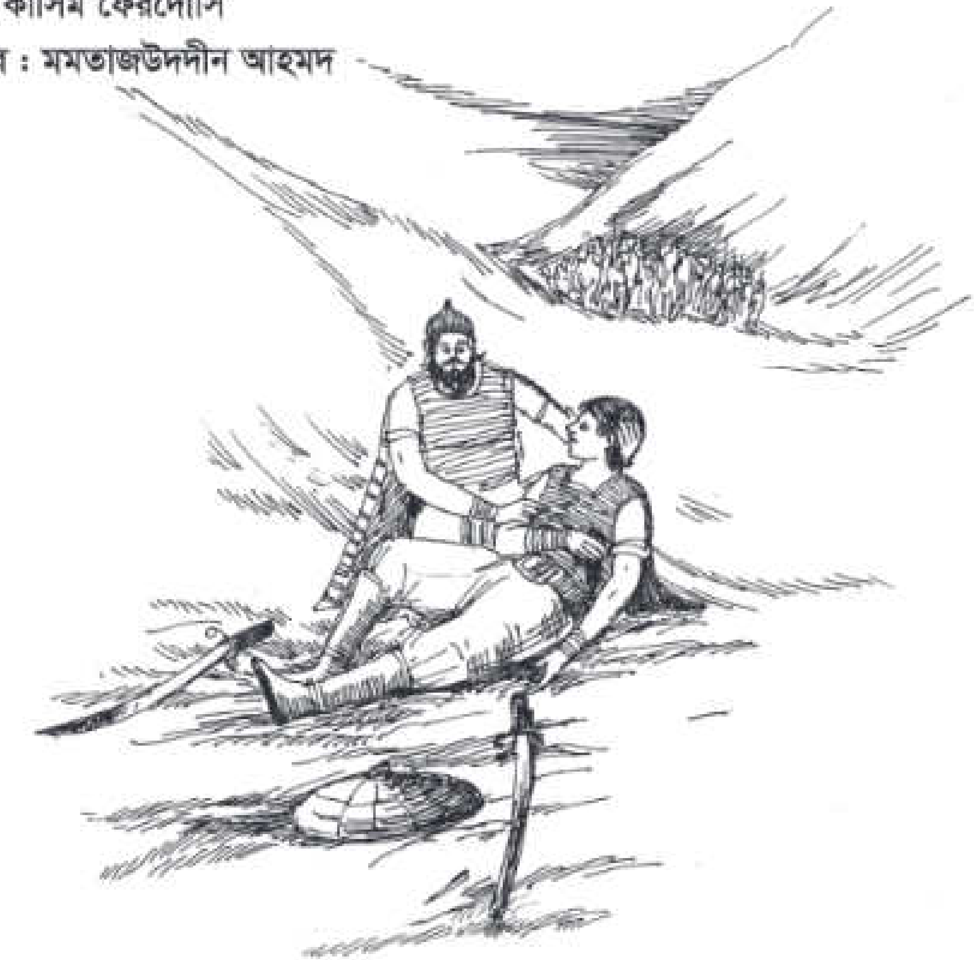

যুদ্ধের সাজ পরে নিল সোহরাব। তার বর্শা আকাশের দিকে ঝলসিত হলো। সে যাবে শত্রু নিধনে, যে তার মাতুল বিন্দারজমকে গোপনে হত্যা করে গেছে। কিন্তু সবার আগে সে সন্ধান করবে জন্মদাতা মহাবীর রুস্তমের। পিতাকে পেলে সমস্ত ক্রোধ নির্বাপিত করে তাঁর বক্ষে মাথা রেখে দীর্ঘক্ষণ শান্তি লাভ করবে সোহরাব।

দুর্গের বন্দি সেনাপতি হুজিরকে নিয়ে সোহরাব পাহাড়ের শীর্ষে উঠল। ব্যাকুল সোহরাব বলল, 'ওই যে সবুজ রঙের শিবির, সেখানে এক বিশাল বীর গর্জন করছেন। আর তাঁর শিবিরের সম্মুখে প্রবল দুরন্ত অশ্ব অধীরতা প্রকাশ করছে, তাঁর পতাকায় আজদাহার চিত্র আঁকা আছে, তাঁর বর্শার ডগায় সিংহের মুখ, কে তিনি? বন্দি সেনাপতি, সত্য করে বলুন তো, তিনি কি মহাবীর রুস্তম?'

সোহরাবের ব্যাকুল প্রত্যাশাকে ক্ষান্ত করে কৌশলী হুজির বললেন, 'আপনার ধারণা সত্য নয়। ওই মহাবীরের প্রকৃত পরিচয় আমি জানি না। তিনি চীনদেশীয় একজন বীর বলে মনে হয়। তবে তিনি যে মহাবীর রুস্তম নন, সে বিষয়ে আমার কোনো ভ্রম নেই।'

সোহরাব বলল, 'তবে যে আমাকে আমার জননী বলে দিয়েছেন, ঠিক ওই রকম দেখতে, ঠিক ওই রকম দেহ মহাবীর রুস্তমের।'

সোহরাব : ওহে বন্দি, আমি তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমাকে বিশ্বাস করব না আমি। আর বিশ্বাস করলে এ সমরে আমার অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন হবে।

হুজির : আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি মহত্তম বীর।

সোহরাব : আপনারা কেউ আমার চিত্তের সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাবেন না।

সোহরাব বেদনায় অস্থির হয়ে ছুটে গেল। তুর্কি সেনাপতি হুমান ও বারমানকে বারবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারাও কি বন্দি হুজিরের মতো অনুমান করেন, এ সমরে মহাবীর রুস্তম অংশগ্রহণ করেননি?' আফ্রাসিয়াবের চতুর সেনাপতিদ্বয় বলল,'আমরাও শুনেছি মহাবীর রুস্তম ক্ষুব্ধ হয়ে জাবলুস্তান ফিরে গেছেন। তিনি এ যুদ্ধে সম্রাট কায়কাউসকে রক্ষা করার জন্য উপস্থিত থাকবেন না।'

ব্যাকুল সোহরাবের সমস্ত প্রত্যাশা মিথ্যার পাথরে আছাড় খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে লাগল। বন্দি হুজির ভয়ংকর মিথ্যা বললেন কেন? তিনিও কি হুমান ও বারমানের সঙ্গে কূটকৌশলে যুক্ত হয়ে পিতাপুত্রকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চান? নাকি এ তার দেশপ্রেম? যে প্রেমের জন্য তিনি সোহরাবকে সুযোগ দেবেন না রুস্তমকে অতর্কিত আক্রমণ করতে। নাকি সব নিয়তির লীলা! বাস্তবিকই মানুষ বড়ো অসহায় নিয়তির লীলার কাছে। তৃষ্ণার্ত যুবক ছুটে এসেছে না-দেখা পিতার সন্ধানে। যে পিতাকে জগতের সবাই চেনে, যাঁর গৌরবে ইরান বিমুগ্ধ, সেই পিতাকে তার পুত্র এত কাছে এসেও চিনতে পারছে না। কেন এমন হলো, এমন কেন হয় মানবভাগ্য?

ক্ষুব্ধ সোহরাব অতি দ্রুত সজ্জিত করল নিজেকে। বর্শা, গদা, পাশ ও সুরক্ষিত বর্মে আচ্ছাদিত করল দেহ। দুরন্ত অশ্বকে নিয়ে বায়ুবেগে ছুটে গেল ইরানিদের প্রান্তরে। শত্রুসৈন্যদের সমাবেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সোহরাব সরাসরি চলে এল সম্রাট কায়কাউসের শিবিরের কাছে। আহ্বান করল সম্রাটকে, মহান অধিপতি, আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। আমি যুদ্ধে আহ্বান করছি আপনার বীর উত্তমদের। আর কোথায় আপনার মহত্তম বীর রুস্তম? শুনেছি তিনি জাবুলস্তান চলে গেছেন, তাঁকেও আহ্বান করে আনুন। আমি যুদ্ধ চাই।

সোহরাবের আহ্বানে সম্রাট কায়কাউস ভীত এবং সচকিত হলেন। যুবকের আহ্বানে ইরানের সেনাপতিবৃন্দ সন্ত্রস্ত হলেন। তার সম্মুখে যাওয়ার সাহস কারও নেই।

এ সংকটকালে একমাত্র রক্ষাকারী মহাবীর রুস্তম। তাঁকে শীঘ্র সংবাদ দেওয়ার হোক। তিনি যদি অভিমান করে এ বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সম্মত না হন, তখন কী হবে?

সেনাপতি গেও গেলেন রুস্তমের শিবিরে সম্রাটের অনুরোধ নিয়ে। গেও বললেন, তুরানের এক যুবক বারবার আপনার নামে আহ্বান করছে। সে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়।

রুস্তম : আমি কেন সেই সামান্য বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করব?

গেও : ইরানের গৌরবের জন্য, ইরান রক্ষার জন্য।

রুস্তম : সংকটকালেই আমার ডাক পড়ে। আমি এবার কেবল যুদ্ধ দেখব, যুদ্ধে লিপ্ত হব না।

গেও : সম্রাটের পরামর্শ, আপনি আত্মপরিচয় গোপন রেখে তুরানি বীরের মোকাবিলা করবেন। সে জানবে আপনি রুস্তম নন, রুস্তমের অনুচরমাত্র।

রুস্তম : আমার শিরস্ত্রাণ, প্রহরণ, আমার বর্শা আর বর্ম দেখলে সে বুঝে নেবে আমিই রুস্তম।

গেও : তাহলে কি অবাধ্য যুবকের দম্ভ মেনে নিয়ে আপনি এ যুদ্ধে নীরব থাকবেন?

রুস্তম : চুপ করো। রুস্তমকে যুদ্ধের বিষয়ে উপদেশ দিয়ো না। যাও, তোমার নির্বোধ সম্রাটকে বলো, আমি যুদ্ধে যাব এবং তুরানি বালকের দম্ভ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত করে তার আশঙ্কা দূর করব।

গেও : আপনি সত্যিই মহান বীর। আপনি প্রকৃত ইরান-ভরসা।

মনের আনন্দে গেও চলে গেলেন। রুস্তম মনে মনে কৌশল করে নিলেন। তুরানি বালকের কাছে তিনি নিজ পরিচয়ে উদ্‌ঘাটিত হবেন না।

সামান্য অনুচর হিসেবে সজ্জিত হলেন রুস্তম। হাস্যমুখে শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে অবিচল পর্বতের মতো অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন সোহরাব। আজ দিনের আলোতে সোহরাবকে দেখে প্রথম দৃষ্টিতে রুস্তম অভিভূত হয়ে গেলেন। এ তো কোনো তুরানি বীর নয়, এ তো ইরানের সন্তান। এ বালকের মুখ তো মহাবীর সামের মুখ। এ বালক কে? কে এই যুবককে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেছে? সে যদি তার জন্মদায়িনী মাতা হয়, তাহলে ভুল করেছে। আমি তো এ বালককে এখনই চির অন্ধকার মৃত্যুর গহ্বরে নিক্ষেপ করব।

আর অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন সোহরাব বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে অবিচল তাকিয়ে আছে রুস্তমের দিকে। কে ইনি? ইনিই কি সেই মহাবীর, যার বিষয়ে আমার মা আমাকে বহু কথা বলেছেন।

সোহরাব : আপনি!

রুস্তম : তুমি?

সোহরাব : আমি সোহরাব।

রুস্তম : আমি রুস্তম নই।

সোহরাব : কে আপনি?

রুস্তম : আমার পরিচয় জানার জন্য তোমাকে পর্বতের ওই নির্জন পাদদেশে যেতে হবে। নিভৃতে আমার পরিচয় দেব তোমাকে।

সোহরাব : আপনি কখনও সামনগা গিয়েছেন?

রুস্তম : সামনগা যাওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার কোনোদিন হয়নি।

সোহরাব : তাহলে আমি যা শুনেছি সব অলীক?

রুস্তম : বালক, তোমার সঙ্গে কেবল যুদ্ধের কথা বলব, সামান্য তুচ্ছ বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করলে আমার প্রভু রুষ্ট হবেন।

সোহরাব : কে আপনার প্রভু?

রুস্তম : আমার প্রভু মহাবীর রুস্তম।

সোহরাব : কোথায় তিনি?

রুস্তম : আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে যদি জীবিত থাকো, তাহলে তোমাকে কেউ না-কেউ বলে দেবে মহাবীর রুস্তম কোথায়? কিন্তু তুমি আদৌ সে সৌভাগ্য নিয়ে ইরানে পদার্পণ করেছ, তা মনে করি না।

রুস্তম ও সোহরাব কোনোভাবেই একে অপরকে চিনতে পারল না। যুদ্ধপ্রান্তরে উভয়ের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, সেখানে স্নেহ ও প্রেমের স্থান নেই। পশু তার সন্তানকে হয়তো চিনতে পারে, স্রোতের মাছ হয়তো তার শাবকদের স্নেহদান করে, কিন্তু প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধীভূত মানবপিতা তার পুত্রকে অথবা মানবপুত্র তার পিতাকে চিনতে পারে না।

পাহাড়ের পাদদেশে সংকীর্ণ প্রান্তরে দুই বীরের যুদ্ধ চলছে। বর্শার যুদ্ধ, গদার যুদ্ধ। দুজনের দুর্দমনীয় যোগ্যতা। দুজনের অশ্ব ক্লান্ত হলো। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে আসন পড়ে গেল। রুস্তম ভাবছেন, এ কোন অজেয় বীর যে আমার এত কালের অহংকার চূর্ণ করার জন্য এসেছে? আর সোহরাব ভাবছে, এই যদি রুস্তমের অনুচর হয়, তাহলে আমার পিতার শৌর্য কত প্রবল!

রুস্তম সোহরাবের কটিদেশের বন্ধন ধরে টান দিলেন। কিন্তু সোহরাবকে এক চুলও নড়াতে পারলেন না। সোহরাব গদা দিয়ে আঘাত করল রুস্তমকে। ব্যথা পেলেন রুস্তম, তাঁর হাতে রক্ত।

সোহরাব বলল, 'আপনাকে আর আঘাত করব না। আপনাকে আঘাত করলে সংকোচ আর ব্যথা হয় আমার। শিবিরে ফিরে যান আপনি।'

রুস্তম ক্রোধান্ধ হলেন। ছুটে গেলেন তুরানিদের মধ্যে। অকাতরে হত্যা করলেন সৈন্যদের। সোহরাবও ছুটে গেল ইরানিদের মধ্যে, সে-ও হত্যা করল বহু ইরানি সৈন্য।

রুস্তম ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সোহরাবকে বললেন, 'এ তুমি কী করছ?'

সোহরাব বলল, 'আপনি যা করলেন তার শোধ নিলাম আমি।'

ক্ষুব্ধ ও বিমর্ষ রুস্তম চলে গেলেন শিবিরে। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'আজ অন্ধকার নেমে আসছে কাল প্রভাতে এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে এসো।'

সোহরাব মৃদু হেসে বলল, 'আপনিও প্রস্তুত থাকবেন।'

সম্রাট কায়কাউসের কাছে নত মস্তকে এলেন রুস্তম। যুবক বীরের শৌর্যের বিবরণ শুনে সম্রাট বিস্মিত হয়ে বললেন, সে এমন কোন বীর, যে আপনার যোগ্যতাকেও বিপন্ন করেছে। মহাবীর আপনি, মোটেই বিষণ্ণ হবেন না, নিবিড় ঘুমে রাত্রিযাপন করুন। আপনার বিজয়ের জন্য সমস্ত রাত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করব আমি।

রুস্তম এলেন নিজের শিবিরে। বীর গেওকে পুনরায় বললেন, তুরানি যুবক বীরের কথা। বালককে দেখামাত্রই তাঁর চিত্তে যে নিদারুণ স্নেহধারা উত্থিত হয়, তা-ও বললেন।

সোহরাব এল শিবিরে। তার মনেও ভীষণ অনিশ্চয়তা। কে এই অজানা মহৎ বীর, যাঁর অস্ত্রচালনা, বর্শা-নিক্ষেপ, গদার গতি অতি দক্ষ ও সুচারু। অথচ তাঁকে কেউ চিনতে পারে না।

এই নাম-না-জানা বীরকে দেখামাত্রই তার যুদ্ধ বাসনা হারিয়ে যায় কেন? তাঁকে আঘাত করতে তার চিত্ত ব্যাকুল হয় কেন? তার বাহুর রক্ত দেখে চিত্ত বিচলিত হয় কেন?

আগামীকাল প্রভাতে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। সে প্রভাত আর কতকাল পরে আসবে? তাঁকে পুনরায় দেখার জন্য যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে। সেনাপতি হুমান, আপনি বলুন এ মহাবীর কে? আমার মা যে বর্ণনা দান করেছেন, তার সঙ্গে এ বীরের অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে। অথচ আপনারা বলছেন, মহাবীর রুস্তম এ সময়ে উপস্থিত নেই। হুমান বললেন, 'হ্যাঁ তা-ই। আপনি এ নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। যে মহাবীরের সঙ্গে লিপ্ত আছেন, তাকে কাল প্রভাতে নিধন করে নিশ্চিত মনে পিতার কথা চিন্তা করবেন। এখন নিঃশব্দ নিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করুন। বিশ্রাম আপনাকে সাহায্য করবে।'

সোহরাব হুমানের কথা শুনে শয্যাগ্রহণ করতে গেল। রাত্রির অবসান হলো। পাহাড়ের অন্তরাল থেকে সূর্যের রক্তিম আভা বিস্তার লাভ করল। পাখিরা কূজন করল।

মহাবীর রুস্তম এলেন প্রান্তরে। শূন্য প্রান্তরে সোহরাব তখনও উপস্থিত হননি। রুস্তমের চিত্ত অকস্মাৎ শূন্য হয়ে উঠল।

সোহরাব এল। তাকে দেখে আনন্দ পেলেন রুস্তম। সম্ভাষণ বিনিময় হলো দুজনের। তরুণ সোহরাব প্রবীণ রুস্তমকে বিনীতভাবে বলল, 'আপনাকে যা বলব, তা একান্ত আমার কথা। আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ চাই না। যে চায়, সে যুদ্ধে লিপ্ত হোক, আমি আর আপনি যুদ্ধ করব না। আমরা বসে বসে অনেক কথা বলব। জীবনের কথা, আনন্দের কথা, শান্তির কথা। প্রয়োজনে আমরা পরিচয় বিনিময় করব। আপনি জেনে নেবেন আমি কে, আমি জেনে নেব আপনি কে? গতকাল আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হয়েছে। আপনার দক্ষতা ও বীরত্বের সন্ধান পেয়ে আমার মনে বারবার সন্দেহ হয়েছে, আপনি স্বয়ং মহাবীর রুস্তম। আজ আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আমাকে বলুন কে আপনি, কোথা থেকে এসেছেন এ যুদ্ধে?'

রুস্তম সোহরাবের প্রশ্নে বিচলিত হলেন। বারবার মিথ্যা বলতে দ্বিধা হলো তাঁর। তিনি বলতে উদ্যত হলেন আমিই রুস্তম। কিন্তু প্রবীণ যোদ্ধা সংশয়ের কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে বললেন, 'আমি দাঁড়ালাম, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি আমি, যুদ্ধই আমার কাম্য। আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হও। না-হয় ভীত শাবকের মতো পলায়ন করে লজ্জিত জননীর কোলে আত্মগোপন ধ্ব মুঃ ম্ব

রুস্তমের বিদ্রুপবাক্যে সোহরাব উত্তেজিত হলো। ত্বরিত প্রস্তুত করল নিজেকে। ছুটে এল রুস্তমের মুখোমুখি। শুরু হলো দুই মহান বীরের মধ্যে মল্লযুদ্ধ। দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী দূরে দাঁড়িয়ে অভূতপূর্ব যুদ্ধ লক্ষ করছে। ধুলায় ধুলাকার হয়ে গেল প্রান্তর। দুই বীরের গর্জনে আকাশ মুখরিত। ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত হলেন প্রবীণ রুস্তম। সোহরাব এক প্রবল চাপ সৃষ্টি করে মহাবীর রুস্তমকে ভূপাতিত করল এবং বিদ্যুৎ গতিতে লাফ দিয়ে তাঁর বুকে চেপে বসল। সোহরাব কোমর থেকে টেনে নিল তীক্ষ্ণধার ছুরি। এখন প্রবীণ ও দাম্ভিক বীরের শির বিচ্ছিন্ন করবে সে।

সোহরাবের অমিত শক্তির নিচে পড়ে আছেন মহাবীর রুস্তম। সোহরাবের তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাতে রুস্তমের প্রাণবায়ু চলে যাবে। সোহরাব তার দুশমনকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে দেরি করছে কেন? সামান্য দেরি তো তার জন্য আত্মঘাতী হতে পারে। তবু সোহরাব আরও একবার শত্রুর মুখ ভালো করে দেখে নিল।

আর মহাবীর রুস্তম তাঁর অপরিমেয় অভিজ্ঞতার গুণে রক্ষা লাভের একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। কিশোর বীর সোহরাবকে বললেন, 'ওহে তুরানি বীর, আমাকে যে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ, তুমি কি যোদ্ধার প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জান না?'

সোহরাব : কী ধর্ম? শত্রুকে হত্যা করতে ধর্মের কী প্রয়োজন?

রুস্তম : তোমার মতো ধর্মহীন তুরানি বীর তো জানে না, ইরানি বীরের একটি ধর্ম আছে। তা হলো, সমকক্ষ বীরকে প্রথম পরাজয়ের কালে হত্যা করা অন্যায়। তাকে আর একটি সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়বার পরাজিত হলেই তুমি নির্দ্বিধায় আমাকে হত্যা করতে পার।

সোহরাব : আমি এমন ধর্মের কথা আগে শুনিনি। কিন্তু তুমি প্রবীণ যোদ্ধা, তোমার কথা অবশ্যই ঠিক।

রুস্তম : হাঁ ঠিক।

সোহরাব : ইরানের মহাবীর রুস্তম কি তোমার এই ধর্ম মেনে চলেন?

রুস্তম : নিশ্চয়।

সোহরাব : তাহলে তোমাকে নিঃসংকোচে মুক্তি দিলাম। এখন বিশ্রামের জন্য চলে যাও। দ্বিতীয়বার পরাজিত হওয়ার জন্য এখানেই চলে এসো। তখন তোমার মৃত্যু ঘটবে।

সোহরাব ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। ক্লান্ত রুস্তম জীবন ভিক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে নদীতীরে অগ্রসর হলেন। আজ তিনি যেমন অবসন্ন, তেমনি মন তাঁর মিথ্যাচারে জর্জরিত। এত বড়ো নিদারুণ লজ্জা তিনি দীর্ঘ জীবনে কোনোদিন পাননি।

তুরানি সেনাপতি হুমান শুনলেন, সোহরাব ভূপাতিত রুস্তমকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। তিনি অনুশোচনায় চিৎকার করে উঠলেন, 'এ আপনি কী করেছেন সোহরাব? জানেন কি, আপনি কাকে মুক্ত করেছেন?'

সোহরাব সচকিত হয়ে বলল, 'কে তিনি?'

হুমান মুহূর্তের মধ্যে সাবধান হয়ে বললেন, 'তিনি নিশ্চয় ইরানের একজন প্রধান বীর।'

সোহরাব হেসে উঠে বলল, 'একজন কেন, দশজন বীরকে আমি ছেড়ে দেব। আমি ইরানে এসেছি মহাবীর রুস্তমের সঙ্গে মিলিত হতে, আমি এখানে যুদ্ধ করতে আসিনি।'

নদীর স্রোতের মধ্যে নেমে রুস্তম বারবার শীতল পানি দিয়ে নিজের মুখ ধুয়ে নিলেন। ধুলায় ধূসরিত শরীর মার্জনা করলেন। বড়ো পিপাসার্ত তিনি। অঞ্জলি ভরে পানি তুলে বারবার পান করলেন। লজ্জায় দুঃখে তাঁর মন এখন অবসন্ন হয়ে আছে। জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় সৃষ্টিকর্তা তাঁকে নিয়ে এ কী নিষ্ঠুর খেলা খেলছেন। সামান্য এক বালকের হাতে তিনি আজ পরাজিত হয়েছেন। অপরিচিত অপরিজ্ঞাত সে বালকের কী পরিচয়?

সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে রুস্তম দুই হাত তুললেন। কাতর কণ্ঠে প্রভুর করুণা প্রার্থনা করলেন, 'হে প্রভু, আমাকে শক্তি দাও, গৌরব সংরক্ষণের শৌর্য দাও আমাকে। এতকাল তুমি আমাকে গৌরবে শীর্ষস্থানীয় করেছ, আজ কোন অপরাধে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত করছ? আমার করুণ আবেদন শ্রবণ কর মহান প্রভু।'

মহাবীর রুস্তমের মনে হলো, মহান প্রভু আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। অমিত শক্তির উত্থান ঘটেছে তাঁর শরীরে। পুনরায় হয়েছেন তিনি অজেয়। কৃতজ্ঞতায় রুস্তমের মন ভরে উঠল। তিনি নদীর স্রোত থেকে উঠে এলেন। এগিয়ে গেলেন যুদ্ধের নিরালা প্রান্তরে। এবার তিনি শৌর্যে স্থির।

দিন গেল। রাত্রি এল। এল নব প্রভাত। ওই তো যুবক ধীরে ধীরে আসছে। যুবকের মুখে মনজুড়ানো সেই স্নিগ্ধ হাসি। যুবকের মুখমণ্ডলে প্রগাঢ় কিরণ। রুস্তমের চিত্ত আবার ব্যাকুল হলো। তবে তা মাত্র ক্ষণিকের জন্য। শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। প্রখর উজ্জ্বল সূর্য ঈশ্বরের প্রতিভূ হয়ে দেখছে পিতা-পুত্রের যুদ্ধ। পুত্র যুদ্ধ করছে পিতার প্রতি সহানুভূতি ধারণ করে। আর পিতা যুদ্ধ করছেন স্বীয় গৌরব সংরক্ষণের জন্য। আজ সোহরাব বড়ো অস্থির, বড়ো চঞ্চল তার মন। ভিন্ন চিন্তায় অন্যমনস্ক সোহরাব অকস্মাৎ পড়ে গেল মাটিতে। মহাবীর রুস্তম তৎক্ষণাৎ তার বুকে বসে পড়লেন দেহের সমস্ত শক্তি নিয়ে।

সোহরাব তবু হাসছে। রুস্তম টেনে নিলেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা। সোহরাব তবু হাসছে। রুস্তম উদ্যত করলেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা। সোহরাব বলল, 'ওহে বীর, এ আমার প্রথম বারের পরাজয়। দ্বিতীয়বার যুদ্ধের জন্য আমাকে মুক্ত ঞ্ব ম্ঃ বীরের ধর্ম পালন ঞ্ব ম্ঃ ম্ব

রুস্তম বললেন, 'শত্রুকে করতলগত করে কোন বীর কোথায় তাকে মুক্ত করেছে হে নির্বোধ বালক?'

রুস্তম বিলম্ব না করে তীব্রভাবে তীক্ষ্ণ ছুরিকা ঢুকিয়ে দিলেন সোহরাবের বক্ষে। সোহরাবের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। আর্তনাদ করল সোহরাব।

আক্রমণকারীকে ব্যথিত কণ্ঠে চিৎকার করে সোহরাব বলল, 'ওরে কাপুরুষ, ইরানি বীর, তুই যা করলি, তার জন্য তোকে সমুচিত শাস্তি পেতে হবে। নির্মম শাস্তি হবে তোর। যদি তুই মাছ হয়ে সাগরের নিচে পালিয়ে থাকিস, যদি বায়ু হয়ে আকাশে মিশে যাস, যদি অগ্নি হয়ে সূর্যের মধ্যে গোপন হোস, আর যদি অন্ধকার হয়ে রাত্রির মধ্যে আশ্রয় লাভ করিস, তবু তোর নিস্তার নেই।'

রুস্তম : কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সোহরাব : নিশ্চয়ই পারবে। যখন ইরানের মহাবীর রুস্তম শুনতে পাবেন তাঁর পুত্র সোহরাবকে তুই অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেছিস, তখন তোর নিস্তার থাকবে না।

রুস্তম : সোহরাব! রুস্তমের পুত্র তুই? মিথ্যা কথা। না, আমার কোনো পুত্র নেই। আমার পুত্র যুদ্ধ করতে আসেনি।

সোহরাব : তুমি রুস্তম! বলো, তুমিই রুস্তম। বলো—

রুস্তম : হাঁ, আমিই রুস্তম।

সোহরাব : পিতা, আমার জন্মদাতা তুমি। আমাকে ছলনা কোরো না পিতা, আমার শেষ বিদায় কালে আমাকে সত্য বলো, তুমি সেই রুস্তম, আমার স্নেহময়ী মাতা তহমিনার স্বামী তুমি, তুমিই আমার পিতা। বলো, আবার বলো।

রুস্তম : হাঁ, আমিই, আমিই। কিন্তু আমি তো জানি—

সোহরাব : কী চ্ছ দঃ তুমি? আমার বর্ম উন্মোচন করো। আমার দক্ষিণ বাহুতে তোমার স্বর্ণকবচ দেখ। মহাবীর সামের হাতের কবচ তুমি দিয়েছিলে আমার জননীকে। আমাকে পুত্র বলে আহ্বান ছ মহ্ আমাকে বক্ষে ধারণ করো পিতা।

রুস্তম : হাঁ, এই তো, এই সেই স্বর্ণকবচ! আমিই দিয়েছিলাম তহমিনাকে। ওরে পুত্র, ওরে সোহরাব, এ কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল! করুণাময় মহাপ্রভু, আমি তো নিজপুত্রকে নিজহাতে হত্যা করার জন্য তোমার কাছে শক্তি প্রার্থনা করিনি।

রক্তের ধারায় সিক্ত সোহরাব পিতার বক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। রক্তের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে ধরণী। মধ্যাহ্নের সূর্য ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। পিতা রুস্তম তীব্র যন্ত্রণায় নিজের শরীরকে নখের আঁচড় দিয়ে ছিন্ন করছেন।

মহাবীর রুস্তম এবং সামানগা-কন্যা তহমিনার একমাত্র সন্তান সিংহশাবক সোহরাব ঘুমিয়ে পড়ল। গাঢ় ঘুম, অনন্ত ঘুম। কার সাধ্য তাকে আর জাগায়?

লেখক-পরিচিতি

আবুল কাসিম ফেরদৌসির জন্ম ৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে (কারও কারও মতে ৯৪১ খ্রি.) ইরানের খোরাসান প্রদেশের তুস নগরে। নিরলস ৩০ বছর পরিশ্রম করে ফেরদৌসি 'শাহনামা' কাব্যটি রচনা করেন। এটি ইরানের জাতীয় মহাকাব্য। এ কাব্যের প্রতিটি চরণ রচনার জন্য এক দিনার করে কবি ষাট হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পাওয়ার আশা করেছিলেন। কিন্তু গজনির সুলতান মাহমুদ তাঁকে ষাট হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দেন। সম্ভ্রম-সচেতন কবি ক্ষোভে-দুঃখে সুলতান মাহমুদের গজনি ছেড়ে বাগদাদে চলে আসেন। সুলতান মাহমুদের দূত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও তিনি আর ফিরে যাননি গজনিতে। শেষজীবনে কবি তাঁর মাতৃভূমি তুস নগরে ফিরে আসেন। গভীর মনোবেদনা নিয়ে পরিণত বয়সে ১০২০ খ্রিষ্টাব্দে মহাকবি ফেরদৌসি মৃত্যুবরণ করেন।

রূপান্তরকারী লেখক-পরিচিতি

মমতাজউদদীন আহমদের জন্ম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায়। তিনি প্রধানত নাট্যকার ও অভিনেতা। কর্মজীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে তাঁর সরকারি কলেজে শিক্ষকতায়। তাঁর ? শয়উল্লেখ্যচনাবলির মধ্যে রয়েছে নাট্যবিষয়ক গবেষণা, মৌলিক ও রূপান্তরিত নাটক এবং বিচিত্র বিষয়ে গদ্যরচনা। তাঁর বিখ্যাত মৌলিক নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'কি চাহ শঙ্খচিল', 'সাত ঘাটের কানাকড়ি' প্রভৃতি। সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি পেয়েছেন বাংলা একাডেমি, একুশে পদক ও শিশু একাডেমি পুরস্কার। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে মমতাজউদদীন আহমদ মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

ফেরদৌসির মহাকাব্য 'শাহনামা' থেকে মূলভাব গ্রহণ করে গল্পটি লেখা হয়েছে। ইরানের পাশের শান্তিপ্রিয় দেশ সামনগার রাজকন্যা তহমিনাকে বিয়ে করেন মহাবীর রুস্তম। বিয়ের অল্পকালের মধ্যে রুস্তম তাঁর রাজ্য ইরানে ফিরে যান। তহমিনার গর্ভে জন্ম নেয় রুস্তমের সন্তান বীর সোহরাব। ছেলে জন্মানোর সংবাদ পেলে রুস্তম সন্তানকে তাঁর মতোই যুদ্ধে নিয়ে যাবে– এ ভয়ে মা তহমিনা স্বামী রুস্তমকে খবর পাঠান একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। এ থেকেই মূল বেদনা-গাথার শুরু। 'যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্র' মহাবীর রুস্তম কীভাবে পুত্র সোহরাবকে হত্যা করল সেই বেদনামাখা কাহিনি। এখানে দেখা যায়, ছেলে সোহরাব পিতার খোঁজে এসেছে ইরান, কিন্তু কেউই রুস্তমের সন্ধান দিতে পারছে না। অথচ নিজেরই অজান্তে তরবারি ধরতে হলো পিতার বিরুদ্ধে এবং মৃত্যুও হলো তার। মৃত্যুর সময় দুজন জানতে পারল যে, সম্পর্কে তাঁরা আসলে পিতা ও পুত্র। মহাবীর রুস্তম অচেনা তুরানি বালকের কাছে পরাজিত না হওয়ার জন্য বীরত্বকে বিসর্জন দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। নিজের হাতে ছুরিবিদ্ধ করে আপন সন্তানের বুক। পরিচয় পাওয়ার পর জীবনে নেমে আসে হাহাকার।

জয় বা বীরত্ব কাঙ্ক্ষিত ও প্রশংসনীয়। কিন্তু বীরত্বের নামে প্রতারণা জীবনে বয়ে আনতে পারে চরম মানবীয় বিপর্যয়– যা এ গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

নিধন — হত্যা।
মাতুল — মামা।
নির্বাপিত — ঁ হ্ন ফ গিয়েছে এমন।
দুর্গ — সৈন্য থাকার স্থান।
চূর্ণ-বিচূর্ণ — গুঁড়া গুঁড়া হওয়া।
কূটকৌশল — চতুর কৌশল।
নিয়তির লীলা — ভাগ্যের খেলা।
বিমুগ্ধ — বিশেষভাবে মুগ্ধ।
দুরন্ত — অশান্ত, ভীষণ।
বীরোত্তম — বীরদের মধ্যে উত্তম।
মহত্তম — সবচেয়ে মহৎ।
সংকটকাল — বিপদের সময়।
শিরস্ত্রাণ — যুদ্ধে মাথায় পরার বর্ম বিশেষ।
দম্ভ — অহংকার।
নিষ্ক্রান্ত — চলে যাওয়া।
অলীক — মিথ্যা, অপার্থিব।
পদার্পণ — পা রাখা, আসা।

অনুশাসন — আইন, প্রথা।
দুর্দমনীয় — যা সহজে দমন করা যায় না।
শৌর্য — বীরত্ব, সাহস।
ক্রোধান্ধ — ক্রোধে অন্ধ।
শিবির — তাঁবু। সেনা-নিবাস।
বিপন্ন — বিপদগ্রস্ত।
মল্লযুদ্ধ — কুস্তি, অস্ত্র ছাড়া যে যুদ্ধ।
তীক্ষ্ণধার — খুব ধারাল।
অমিত — অপরিমিত, প্রচুর।
অপরিমেয় — অসংখ্য, ধঁ মবঙ্ক করা যায় না এমন।
জর্জরিত — নিপীড়িত, জীর্ণ।
অনুশোচনা — পরিতাপ, খেদ।
করতলগত — নাগালের মধ্যে। মুঠোর ভেতরে।
স্বর্ণকবচ — সোনা দিয়ে বানানো মাদুলি বা তাবিজ।

নাটিকা

জাগো সুন্দর

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রথম অঙ্ক

কঙ্কণ : ওংকার! ওংকার! খেলতে খেলতে আমরা এ কোথায় এসে পড়েছি? কে আমাদের এখানে আনলে?

কল্পনা : আমি– তোমাদের দিদি কল্পনা। কঙ্কণ ভালো করে চেয়ে দেখো দেখি আমাকে চিনতে পারো কি না।

কঙ্কণ : না– হ্যাঁ, তোমায় যেন কোথায় দেখেছি, অথচ ঠিক মনে করতে পারছিনে।

কল্পনা : আচ্ছা, আমি মনে করিয়ে দিই। কাল রাত্রে ছাদে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে চুপ করে কী ভাবছিলে, মনে পড়ে?

কঙ্কণ : হ্যাঁ, মনে পড়েছে : ভাবছিলাম, আমি যদি ওই চাঁদের দেশে এক নিমেষে উড়ে যেতে পারতুম, তাহলে কী মজাই না হতো। তারপর মনে হলো আমার মনের ভিতর কে যেন এক ডানাওয়ালা সুন্দরী পরি আছে, সে যেন জাদু জানে, সে যেন এক নিমেষে আমায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেতে পারে।

কল্পনা : ঠিক ধরেছ! এখন চেয়ে দেখো দেখি, আমি সেই পরির মতো কিনা!

কঙ্কণ : আরে, ঠিক সেই তো! একেবারে হুবহু মিল! আমার মনের সেই পরি তুমি। তোমার নাম কী বললে?

কল্পনা : আমার নাম কল্পনা। আমায় কল্পনাদি বলে ডেকো!

কঙ্কণ : ধ্যাৎ, তুমি যে আমারই মতো বড়ো। তোমাকে– আচ্ছা দিদি বললে যদি সুখী হও, তা-ই বলব। কিন্তু–

কল্পনা : বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তুমি যেখানে যেতে চাইবে আমি সেইখানেই নিয়ে যাব। এখন চলো সাগর জলের তলে। (সাগরের শব্দ ভেসে এল)

কামাল : এই কঙ্কণ! পালিয়ে আয়! ও জাদু জানে, পরির বাচ্চা, উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এই যাহ্! তোর মাদুলিটা ফেলে এসেছিস বুঝি? দেখি আমার তাবিজটা আছে কি না! অ্যাঁ, আমার তাবিজটা– কে নিলে?

কল্পনা : এখন আর কোনো কিছুতেই কিছু ফল হবে না কামাল! আমি তোমাদের ফুলের রথে করে সমুদ্র-জলে নামতে শুরু করেছি! ও কী, ওংকার অমন চোখ বুজে আছ কেন?

ওংকার : ভয় পেলে আমি চোখ বুজে বসে থাকি। কিংবা প্রাণপণে চেঁচিয়ে গান করি।

কল্পনা : এই চোখ বোজা কার কাছে শিখলে?

ওংকার : ভেড়ার কাছে।

কল্পনা : ভেড়ার কাছে?

ওংকার : হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ে দেখেছিলুম, একপাল ভেড়ার মাঝে একটা নেকড়ে বাঘ এসে পড়ল। যেই নেকড়ে বাঘ দেখা আর অমনি পালের সব ভেড়া গোল হয়ে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল।

কল্পনা : আর তাই দেখে বুঝি নেকড়ে বাঘ পালিয়ে গেল!

ওংকার : দূর! তা হবে কেন? নেকড়ে বাঘ ভেড়াদের এক-একটার কান ধরে ঘাড় মটকে রেখে আসে, এসে আবার একটার কান ধরে নিয়ে যায়!

চাকাম ফুসফুস : ওরে ব্বাবারে! গেছি রে গেছি রে, একেবারে মরে গেছি রে মা! (সমস্ত 'স'-এর উচ্চারণ দন্ত্য 'স' দিয়ে) আজ সকালে সালকের শ্মশান ঘাটে সিনান করতে গিয়ে এই সর্বনাশটা হলো। শ্মশানের শ্যাওড়া গাছের ব্রহ্মদৈত্য চমরেছে রে বাবা!

কল্পনা : ও কে চিৎকার করে অমন করে? কে ওই ভীরু?

কঙ্কণ : ওর নাম ন্যাড়া, আমরা ওর নাম রেখেছি চাকাম-ফুসফুস! ও বড়ো ভীতু কিনা! একটু ভয়ের কথা শুনলেই ওর ফুসফুস চুপসে গিয়ে বুকে গর্ত হয়ে যায়।

কামাল : আর মুখ শুকিয়ে গিয়ে চাকাম চুকুম শব্দ করতে থাকে– তাই ওংকার ওর নাম রেখেছে চাকাম ফুসফুস। [সমুদ্রের শব্দ]

ওংকার : উহ্ কী ভীষণ গর্জন!

কামাল : কী ঠান্ডা হিমেল বাতাস! আমার গা শিরশির করছে!

চাকাম ফুসফুস : আমার দাঁতে দাঁত লাগছে। শ্মশান দেখে কী সর্বনাশটাই হলো! হি হি হি হি! [দাঁতে দাঁত লাগার শব্দ]

কঙ্কণ : আমার কিন্তু চমৎকার লাগছে কল্পনাদি, কিন্তু অত অন্ধকার কেন? সমুদ্রে কি আলো নেই?

কল্পনা : সাগর-জলের নিচে মণিমুক্তার আলো। আর দেরি নেই, ওই আমরা এসে পড়েছি– সাগরজলের পাতালতলে! খোলো দুয়ার।

[হঠাৎ যন্ত্রসংগীত ও সাগর-গর্জন বন্ধ হয়ে গেল]

কঙ্কণ : [হাততালি দিয়ে] কল্পনাদি, দেখো দেখো কী সুন্দর আলো! কত হীরা মানিক মুক্তো! কামাল! ওংকার!

কামাল : এই কঙ্কণ, খবরদার, ওসব হীরা মানিক ছুঁসনে! আমাদের গাঁয়ে একজন পুথি পড়ছিল, তাতে লেখা আছে– ওসব পরিদের হিকমত। ছুঁলেই পাথর হয়ে যাবি!

ওংকার : হাফপ্যান্টের পকেট তো ভরতি হয়ে গেল হীরা মানিকে। আর নিই কোথায়? বাবাকে কতবার বললাম যে, হাফপ্যান্টের দুটো বুক পকেট করে দাও, তা বাবা শুনলেন না। গায়ের জামাটাও ভুলে রেখে এলুম।

চাক্কাম ফুসফুস : ওরে বাপ রে! কী সর্বনাশটাই হলো। এ যে খই-মুড়ির মতো হীরা ছড়ানো রয়েছে। নিলে শ্যাওড়া গাছের ওই রক্ষীদল ধরবে না তো?

কল্পনা : শোনো কঙ্কণ, ওংকার, কামাল! তোমরা বড়ো হয়ে আসবে এই সাগর-জয়ে। এই সাগরকে যে বীর জয় করবে– সে-ই পাবে এই সাগরের হীরা মানিক মুক্তো। এই পাঞ্চজন্য শঙ্খে বেজে উঠবে তারই শুভ আগমনী বার্তা! কামাল তুমি কী হবে?

কামাল :

আমি সাগর পাড়ি দেব, হব সওদাগর!
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে!
ময়ূরপঙ্খি বজরা আমার লাল রঙা পাল তুলে
ঢেউ-এর দোলায় হাঁসের মতন চলবে হেলে দুলে।

কল্পনা : আর কঙ্কণ?

কঙ্কণ :

সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, হব সিন্ধুপতি;
আমার রাজ্যে কর জোগাবে রেবা ইরাবতী।
কত সিন্ধু ভাগীরথী

[সাগর-জলের শব্দ! পুষ্পরথ যেন সাগর হতে উঠে অন্যত্র চলে গেল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ভোর হয়ে এল। পাখির কলরব ভেসে আসছে]

বেণু : কঙ্কণদা, ওংকারদা! চোখ খোলো, আমরা সমুদ্দুর থেকে উঠে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। ওই দেখো, সুয্যি উঠছে।

ওংকার : বায়স্কোপের সুয্যি নয় তো! কল্পনাদির মায়ায় সব ভুল দেখছি মনে হচ্ছে।

কল্পনা : খুকি, তুমি কোত্থেকে এলে? তোমার নাম কী?

বেণু : আমার নাম বেণু। আমি কোথাও থেকে আসিনি, এইখানেই লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলুম। সব শুনেছি সব দেখেছি। ভয়ে কথাটি কইনি!

কল্পনা : তা বেশ, আমরা এখন চাঁদের দেশে, মঙ্গলগ্রহে যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

বেণু : [ভয় পেয়ে] না! আমাকে পুকুরের কাছে নামিয়ে দাও, আমি এক ছুট্টে বাড়ি পালাব!

ওংকার : তোর আঁচলে কী রে বেণু? অ! আমার হাফপ্যান্টের পকেট থেকে সব মুক্তো মানিক চুরি করেছিস বুঝি? দে, দে আমার মুক্তো দে।

বেণু : বা রে, তোমার ছেঁড়া পকেট গলে ওগুলো আপনা থেকে আমার কাছে এসেছে। আমি চুরি করব কেন? আচ্ছা, ওংকারদা, তোমরা ছেলে, তোমরা ও নিয়ে কী করবে? এখন ওগুলো আমার কাছে থাক, তোমার বউ এলে মালা গেঁথে উপহার দেব।

চাকাম-ফুসফুস : [কল্পনাকে উদ্দেশ্য করে] কাল-ফণী দিদি! ওই শ্যামবাজারের দোতলা বাস যাচ্ছে— ওর ছাদে আমায় টুপ করে ফেলে দাও না। আমি র হুকরে সোজা সরে পড়ি! কী সর্বনাশটাই হলো আমার।

কল্পনা : তোমার ভয় দূর না-হওয়া পর্যন্ত এমনি ভয় দেখিয়ে নিয়ে বেড়াব তোমায়। ভয়ের মাঝে রেখেই তোমার ভয় দূর করব। আচ্ছা বেণু, তোমার কী ভালো লাগে? চাঁদের দেশ, না মাটির পৃথিবী?

বেণু : মাটির পৃথিবী। আমি এই পৃথিবীকে খুব ভালোবাসি। একে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। ও যেন আমার মা।

কল্পনা : আচ্ছা, এই পৃথিবীতে তোমার কী হতে ইচ্ছা করে?

বেণু : আমার ইচ্ছা করে—

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুমবাগে উঠব আমি ডাকি।
সুয্যিমামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
'হয়নি সকাল, ঘুমো এখন' মা বলবেন রেগে।
বলব আমি, 'আলসে মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল তাই বলে কি সকাল হবে নাকো?
আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার মেয়ে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে!'

ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহনায়
বলব আমি, 'ভোর হলো যে, সাগর ছুটে আয়।'
ঝরনা-মাসি বলবে হাসি, 'খুকি এলি নাকি?'
বলব আমি, 'নইকো খুকি, ঘুম-জাগানো পাখি।'

ওংকার : কল্পনাদি, মঙ্গল গ্রহ না চাঁদের দেশে যাবে বলছিলে না? সমুদ্রের জলে ভিজে আমার ভীষণ সর্দি ধরেছে— তাই বলছিলুম যা যুদ্ধ লেগেছে কল্পনাদি, তাতে বুঝে দেখলুম, আমার রাজা টাজা হওয়া পোষাবে না। ও বক্কির চেয়ে অনেক ভালো—

আমি হব গাঁয়ের রাখাল ছেলে!

বলব, 'দাদা, প্রণাম তোমায়, ঘুম ভাঙিয়ে গেলে।'
আঁচল ভরে মুড়ি নেব, হাতে নেব বেণু,
নদীর পারে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু।
বাছুরটিরে কোলে করে পার হব বিল-খাল,
বটের ছায়ায় জুটবে এসে রাখাল ছেলের পাল।

কঙ্কণ : কল্পনাদি, তোমার রথ থামিয়ো না। চলো হিমালয়ের গৌরীশংকরের চূড়ায়, উত্তর মেরুর বরফ পেরিয়ে নাম না-জানা দেশে। চলো চাঁদের বুকে, মঙ্গলগ্রহে।

কল্পনা : তোমায় নিয়ে যাব কঙ্কণ, অসীমের সীমা খুঁজতে— অকূলের কূল দেখাতে। তার আগে তোমার পৃথিবীর কাজ সেরে নিতে হবে। ধরো, পৃথিবীতে যদি তোমায় কাজ করতে হয়, তুমি কী করবে?

কঙ্কণ : আমি গাইব গান— আর সারা পৃথিবীর মানুষ ধরবে তার ধুয়া।

(গান)
চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...

কল্পনা : শুধু গান গাইবে? কর্ম করবে না?

কঙ্কণ : কর্মই তো আমার প্রাণ। কাজ করি বলেই তো রাত পোহায়।

আমি হব দিনের সহচর—
বলব, 'ওরে রোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে কর!
তোদের ছেলে উঠল জেগে, ওই বাজে তার বাঁশি,
জাগল দুলাল বনের রাখাল, ওঠ রে মাঠের চাষি।'
'শ্যাওলা' 'হাঁসা' দুই না বলদ দুই ধারেতে জুড়ে
লাঙলের ওই কলম দিয়ে মাটির কাগজ খুঁড়ে
লিখব সবুজ-কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি—
ওপর হতে করবে আশিস দীপ্ত রাঙা রবি।
খামার ভরে রাখব ফসল, গোলায় ভরে ধান,
ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিকে আমি দেব প্রাণ।
এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখব চিরতাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা॥

[হঠাৎ সকলে 'ধর ধর গেল' বলে চিৎকার করে উঠল। চাকাম-ফুসফুসের, 'কী সর্বনাশটাই হলো রে বাবা' বলে চিৎকার শোনা গেল]

ওংকার : কল্পনাদি, কল্পনাদি, ধরো ধরো, চাকাম-ফুসফুস পুকুর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কল্পনা : [হেসে] ভয় নেই, ও জল থেকে সাঁতরে ডাঙায় উঠে বাড়ির দিকে দৌড় দেবে! তবে দৌড়ে পালাবে কোথায়? আবার আমার কাছে ধরা দিতেই হবে! ও কি বেণু? কাঁদছ? ওগুলো মুক্তো মানিক নয়। তোমরা শুধু ঝিনুক কুড়িয়ে এনেছ। যেদিন তোমার দাদারা সত্যিকার সাগর জয় করে আসবে আর তোমরা মেয়েরা তাদের সাহায্য করবে ওই সাগর অভিযানে– সেই দিন সত্যিকারের মুক্তো মানিক পাবে। –তার আগে নয়।

কঙ্কণ : ওদের নামিয়ে দিয়ে আমায় নিয়ে চলো না কল্পনাদি চাঁদের দেশে। সেখান থেকে পৃথিবীতে আনব– অমৃত, জরা মৃত্যু থাকবে না– থাকবে শুধু সুন্দর চির-কিশোর।

[রথের দূরে যাওয়ার শব্দ]

(গৃহকর্মীর প্রবেশ)

গৃহকর্মী : হেই খোকাবাবু উঠো উঠো। সারা রাত্তির কি ছাদে শুয়ে থাকবে? ঠান্ডা লাগিব যে! উঠো! উঠো!

ওংকার : কঙ্কণদাকে উঠিয়ো না– ও এখন 'রকেট' করে চাঁদের দেশে গিয়ে জ্যোৎস্নার আরক খাচ্ছে। আমি ততক্ষণ ওর পকেটের কমলালেবুটা খেয়ে ফেলি!

[যবনিকা]

লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল দুখু মিয়া। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংরেজ সেনাবাহিনির বাঙালি পল্টনে যোগ দেন। এ সময়ই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর রচনায় সামাজিক অবিচার এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। তাঁর রচিত কাব্য– 'অগ্নি-বীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'বিষের বাঁশি' ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ– 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'শিউলি-মালা'। উপন্যাস– 'বাঁধন-হারা', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা'। নাটক– 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'শিল্পী', 'মধুমালা' প্রভৃতি। প্রবন্ধ– 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', 'যুগবাণী', 'দুর্দিনের যাত্রী'। কবি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

কল্পনাশক্তি মানুষের অমূল্য সম্পদ। এ নাটিকায় কিশোর কঙ্কণের দল স্বপ্ন-কল্পনায় এক পরির সহযোগিতায় চলে যায় সাগরতলের অজানা দেশে। তারা রকেটে চেপে যেতে চায় চাঁদের দেশে ও মঙ্গলগ্রহে। তারা হতে চায় সওদাগর, বিজ্ঞানী কিংবা গ্রামের রাখাল ছেলে। স্বপ্নে পরির রথে চড়ে তারা ঘুরে এসেছে কল্পনার বহু দেশ থেকে। একপর্যায়ে সকালবেলায় তাদের গৃহকর্মী এসে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তারা বাস্তবে ফিরে আসে। তখন বোঝা যায় কিশোরের দলটি ঘরের ছাদে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

নাটিকাটিতে কৌতুকপূর্ণ সংলাপ ও দৃশ্যের মাধ্যমে মানুষের স্বপ্ন-কল্পনার ছবি প্রকাশিত হয়েছে। মজার বিষয় হলো– কাজী নজরুল ইসলাম যখন এ– নাটিকা রচনা করেন, তখনও চাঁদের দেশে মানুষের পা পড়েনি।

শব্দার্থ ও টীকা

মাদুলি — ধাতুর তৈরি ছোটো ঢোলের মতো কবচ।
রথ — চাকাযুক্ত অথবা চাকাহীন একধরনের কাল্পনিক বাহন।
শ্মশান — যে স্থানে মৃতদেহ দাহ করা হয়।
সিনান — স্নান।
রক্তচোষা — কল্পিত পেত্নী।
মণি — দামি পাথর, যা গহনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
মুক্তা — রত্নপাথর। মুক্তা ঝিনুকের মধ্যে তৈরি হয়।
পুথি — হাতে লেখা [illegible] বই বা পাণ্ডুলিপি।
হিকমত — কৌশল, কায়দা, চাতুর্য।
বুক পকেট — বুক বরাবর জামার পকেট।
শ্যাওড়া গাছ (শেওড়া) — এক ধরনের জংলা গাছ।
পাঞ্চজন্য — শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম।
সওদাগর — বড়ো ব্যবসায়ী।
মধুকর — মৌমাছি, ভ্রমর।
বিশ্বজোড়া — পৃথিবীজুড়ে।
ময়ূরপঙ্খী — ময়ূর আকৃতির নৌকা।
বজরা — একপ্রকার বড়ো নৌকা।
সিন্ধুপতি — সাগরের রাজা।
রেবা — প্রাচীন ভারতের একটি নদী। বর্তমান নাম নর্মদা।
ইরাবতী — পাঞ্জাব অঞ্চলের নদী।
সিন্ধু — বিখ্যাত নদী। এ নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা— যা সিন্ধুসভ্যতা নামে পরিচিত।
ভাগীরথী — ভারতের একটি নদী।
পুষ্পরথ — ফুল দিয়ে সাজানো রথ।
বায়স্কোপ — চলচ্চিত্র, সিনেমা।
মঙ্গল গ্রহ — সৌরজগতের একটি গ্রহ।
দোতলা বাস — দুই তল বা স্তর বিশিষ্ট বাস।
বেণু — বাঁশি।
ধেনু — কঁফু

গৌরীশংকর	— হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
উত্তর মেরু	— পৃথিবীর সর্ব-উত্তরের বরফ আচ্ছাদিত প্রান্ত।
মাদল	— একধরনের বাদ্যযন্ত্র।
আশিস	— আশীর্বাদ।
দীপ্ত	— উজ্জ্বল।
রবি	— সূর্য। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বোঝানো হয়েছে।
খামার	— মাঠ থেকে শস্য এনে রাখার এবং ঝাড়াই-মাড়াই করার জায়গা।
গোলা	— ধান রাখার জায়গা।
রকেট	— মহাকাশযান। ইংরেজি Rocket.
আরক	— নির্যাস বা সারবস্তু।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম–আনন্দপাঠ

পরামর্শ মানসিক শক্তি বাড়ায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।